মধুরাই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক

উদয় বুক ডিপো

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ :
করিপক্ষ, ১৩৬৯

প্রকাশক :
উদয়বরণ গুহ
৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ সজ্জা :
শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
সরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২সি শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা—৬

শিল্পী

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের

শৈলজানন্দের শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বনির্বাচিত গল্প
কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
কয়লাকুঠির দেশ
নতুন করে পাওয়া
একি অপরূপ
রূপং দেহি ধনং দেহি
ঠিক ঠিকানা
মিতে মিতিন
বনে চন্দন
মনোহারিকা
মানে না মানা
তুমি তৃষ্ণার জল
দুটি ফুল দুটি প্রাণ
জীবন আরও বড়
রজনী এখনো বাকী
চেনা-চেনা মুখ
ইত্যাদি।

এক

বোশেখের শেষ।

গ্রামে কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে যাত্রাগান এসেছিল। তিনদিন ধরে তারা মহাসমারোহে পালাগান গেয়ে চলে গেল।

পালা ছিল সীতাহরণ।

রাম, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হনুমান—কত রং বেরঙের সাজ-পোষাক পরে তারা অভিনয় করলে।

তারা চলে গেলেও গ্রামের বুকে কিন্তু সে পালাগানের রেশ অনেকদিন পর্য্যন্ত রয়ে গেল।

গ্রামের ছেলেরা যাত্রাগান শুনতে মেতে উঠেছিল। এবারে তারা কেউ রাম সাজলে, কেউ রাবণ সাজলে। মহাসমারোহে তারাও সেই যাত্রার উৎসব নিয়ে মেতে উঠল—যাত্রার অনুকরণ সুরু হয়ে গেল সারা গাঁয়ে।

কেউ গাইলে রাবণ বধ, কেউ দক্ষযজ্ঞ, কেউ সীতাহরণ।

অবশ্য তাদের সাজপোষাক কিছু নেই—তাতেও উৎসাহের কোন কমতি দেখা গেল না।

সাজপোষাক না থাকল ত বয়েই গেল—তারা ত আছে!

নানা পোষাক পরে অভিনয় করে তারা—অনেক সময় কিছুই পরে না—যেখানে সেখানে কতকগুলি ছেলে একত্র হয়ে চীৎকার জুড়ে দেয়।

সেদিন জ্যেষ্ঠের গরমে কেউ বাড়ির বের হয় নি।

এই সময় দুটি অল্প বয়স্ক ছেলে অলক আর সুধীর রামচরণের নির্জন খামার বাড়িতে রাম আর রাবণ সেজে দুটি বাখারীর তরবারী হাতে নিয়ে জোর যুদ্ধ সুরু করে দিয়েছিল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আবার চলছিল মাইকেলী ছন্দে অদ্ভুত সব বক্তৃতা। অবশ্য সেগুলি সবই তাদের স্বরচিত। যেমন—

হারে ওরে দুর্বৃত্ত রাবণ,
কোথা তুই ছিলি এতক্ষণ।
সীতারে হরিলি ওরে শয়তান
এবার পাঠাব তোরে যমধাম।

কিন্তু তাদের ওই অদ্ভুত পালাগানের মাঝখানে হঠাৎ বাধা পড়ে গেল।

সবেমাত্র অলক আর সুধীরের মধ্যে তর্ক জমে উঠেছিল, কেন অলক সুধীরের পিঠে মেরেছে? রাম সেজেছে বলে সে কি লাটসাহেব হয়ে গেছে?

এমন সময় বাইরে ডাক শোনা গেল—চাই বারোভাজা, সন্দেশ নকুল-দানা, ঘুগনী···

সঙ্গে সঙ্গে দুজনেব কলহ মিটে গেল।

রাম-রাবণ দুজনে বাখারী ফেলে দিয়ে ছুটল সোজা বড় রাস্তার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ফিরিওলা তখন তার লাল, নীল রঙের অপূর্ব বারোভাজা সন্দেশের কাঠের ঘরকাটা ডালাটা মাথা থেকে নামিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে গান গেয়ে খদ্দেরের মনোযোগ আকর্ষণ করছিল।

সুধীব তার কাছে এসে লোলুপ দৃষ্টিতে খবারগুলি দেখতে লাগল। একটু পরে কোমর থেকে একটা পয়সা বের করে বললে—দে ত এক পয়সার নকুলদানা।

অলকের সঙ্গে পয়সা ছিল না। দৌড়ে সে বাড়ির দিকে গেল।

বাড়ীতে ঢুকে চীৎকার করে ডাকলে—মা, পয়সা দাও দুটো, বারো ভাজা খাব।

কমলা তখন সবে খেতে বসেছিল। অলকের কাণ্ড দেখে ভেতর থেকে বললে—এইমাত্র ভাত খেয়ে গেলি হতভাগা, এরই মধ্যে ওসব খেতে হবে না। আমি খেতে বসেছি। যা—

—দাও না মা একটা পয়সা। ওদের সুধীর যে কিনলে।

কমলা এবারে একটু রেগে উঠল। বললে—জ্বালাসনি বলছি অলক। পয়সা নেই আমার কাছে, বেরো—

অলক আর দ্বিরুক্তি করলে না। মুখ ভার করে নিঃশব্দে বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

দু' তিনবার ডেকেও অলকের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে কমলা মনে করলে, সে চলে গেছে!

কিন্তু খাওয়া শেষ হতেই বাইরে এসে দেখলে সে তখনও দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কমলা হাত ধুয়ে, তাড়াতাড়ি একটা পয়সা এনে অলকের হাতে দিয়ে বললে—নে পয়সা! কাঁদতে নেই, ছি!

চোখের জল মুছিয়ে অলকের মাথায় চুম্বন করতেই সে মুখ তুলে ফিক্ করে হেসে বললে—হ্যাঁ, কাঁদছি যেন!

হাতে পয়সা পেয়েই অলক হাসিমুখে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বিষণ্ণ মুখে অলক ফিরে এসে পয়সাটা কমলার পায়ের কাছে জোরে ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—নাও তোমার পয়সা। অতক্ষণে নাই বা দিতে; চলে গেছে সে।

ওপর থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে হাঁক ভেসে এলো—অলক দুপুরবেলা দৌড়ে বেড়াচ্ছিস বুঝি?

কমলা বললে—শুনেছিস তোর মামা কি বলছেন? বলে দেব এবারে? অলক ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ধীরে ধীরে বললে—না মা, বলো না, তোমার পায়ে পড়ি। আমি এইখানে চুপ করে ঘুমোচ্ছি।

ঘরের একপাশে একটা চৌকির ওপর বিছানা পাতা ছিল। অলক ভয়ে ভয়ে গিয়ে তার ওপর শুয়েই কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

এমনি করেই এই নিঃসন্তান কমলা এই বাপ মা মরা ছেলে অলককে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছিলেন।

সম্পর্কটা ভাল করে বোঝাতে গেলে আরও কিছু আবশ্যক।

সে আজ প্রায় সাত আট বছর আগেকার কথা।

একদিন অপরাহ্ন বেলায় বিধবা মণিমালা এক বছরের ছেলে অলককে কোলে নিয়ে নিতান্ত আশ্রয়হীনের মতই পিতৃগৃহে ফিরে এলো।

পিত্রালয়ে থাকবার মধ্যে শুধু ছিল তার ছোট ভাই অমরেশ আর তার নবপরিণীতা বৌ কমলা।

দিদির এই অবস্থা দেখে অমরেশ চোখের জল মুছে সাদরে তাকে ঘরে তুলে নিলে। কিন্তু নিলে কি হয়, বিধবা মণিমালাকে বেশিদিন ভাইয়ের বাড়ি থাকতে হলো না। শিশু পুত্র অলককে কমলার হাতে তুলে দিয়ে সে একদিন কোন অজ্ঞাতলোকে চলে গেল।

সেইদিন থেকে অলক কমলার হাতেই মানুষ হচ্ছিল। সম্পর্কে মামী হলেও সে তাকে মা বলে ডাকত।

কমলার সন্তানাদি কিছুই হয়নি। তাই এই মা মরা ছেলেটিকে নিয়েই সে তার দুঃখ ভুলেছিল। তবু একটা অজানা আতংকে সে মধ্যে মধ্যে শিউরে উঠত। বুক আলোড়িত করে সময়ে অসময়ে এই কথাটাই শুধু বার বার মনে হতো, পরের ছেলে মানুষ করেছি, কবে হয়ত ছিনিয়ে নেবে কিনা কে জানে।

কমলা মনে মনে যে আশংকা করেছিল, অবশেষে একদিন তাই সত্যি হলো।

অলকের এক ধনী জ্যেঠা কোলকাতায় থাকতেন। তাঁরই কাছ থেকে এতদিন পরে হঠাৎ অমরেশ একখানা চিঠি পেলো। তিনি লিখেছেন, অলক সেখানে থেকে মূর্খ হচ্ছে। তাকে তিনি নিজের

কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাতে চান। অতএব এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি নিজে গিয়ে যেন তাকে নিয়ে আসবেন।

সুদীর্ঘ আট বছর পরে কেমন করে যে রমেশবাবুর হঠাৎ এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির কথা মনে পড়ে গেল, অমরেশ অনেক ভেবে-চিন্তেও তা কোন প্রকারেই স্থির করতে পারলে না। এই চিঠির সত্যটা যে কেমন করেই বা কমলাকে জানাবে।

তিন চারদিন ধরে বলি বলি করে করেও অমরেশ সে সম্বন্ধে কোন কথাই কমলাকে জানাতে পারলে না। অবশেষে একদিন নিষ্ঠুরের মত কথাটা তারই সুমুখে প্রকাশ করে বলে ফেললে—হ্যাঁগা, কি করি বল দেখি, অলককে যে তার জ্যেঠা দিয়ে যেতে চায়।

কমলা রন্ধনশালার কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। কথাটা শুনতেই তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি স্বামীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কে বললে ?

চিঠিখানা অমরেশ হাতে করেই এনেছিল। ধীরে ধীরে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললে—ছ্যাখ পড়ে।

চিঠিখানা ভাল করে পড়তে পড়তে কমলার মনে হতে লাগল, কি যেন একটা গুরুভার পদার্থ বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বের হতে চাইছে।

পড়া শেষ হলে প্রাণপণ চেষ্টায় উচ্ছ্বসিত কান্না নিরোধ করে কমলা কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পরে সহজ কণ্ঠে বললে—বেশ তো! এখানে থাকলে লেখাপড়া ত কিছু হবে না আর তবে আবার দুঃখ কি ?

সেদিন রাতে কি একটা স্বপ্ন দেখে হঠাৎ কমলার ঘুমটা ভেঙে গেল। যে দেখলে—অলক তার কোলের কাছে নির্ভয় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। জানালার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে তার সুন্দর মুখখানির ওপর।

নির্নিমেষ নয়নে বহুক্ষণ ধরে তার সুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতেই দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রুরাশি নেমে এলো। ধীরে ধীরে অলককে কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করতেই সে জেগে উঠে ডাক দিলে—মা!

আঁচলে চোখ মুছে কমলা বললে—বাবা!

দুজনেই নীরব।

কিছুক্ষণ পরে কমলা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললে—হ্যাঁ রে অলক, তোর এই মাকে কখনো ভুলে যাবি না তো?

অলক তার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—দ্যুৎ, তাই কি হয়!

তারপর কমলা তাকে তার কলকাতা যাবার কথা, সেখানে থেকে পড়বার কথা, তার জ্যেঠার কথা, যা জানত সব বললে একে একে। সব শুনে অলক বললে—তুমি যাবে না মা?

—না বাবা। তুমি যাবে লেখাপড়া শিখতে। সেখানে তোমার জ্যেঠিমা জ্যোঠামশাই আছেন, কত ভালবাসেন তাঁরা। ছুটি হলে আমাদের কাছে এসো। কেমন?

অলক বললে—না, তুমি না গেলে আমার বয়ে গেছে যেতে!

কমলা সস্নেহে বললে—না বাবা, সে কি বলতে আছে? তোমার জ্যেঠা আসবেন যে!

জ্যেঠা না ফেটা! সাহেবের বোয়ান ঝোপে এমন লুকিয়ে থাকব যে সারাদিন খুঁজেই পাবে না। দেখবে তখন মজাটা!

কমলা দেখলে, এ দুরন্ত ছেলেকে সম্মত করান শক্ত কথা। ভাবলে, সে নিজেও ত ছেড়ে থাকতে পারবে না। না-ই বা গেল সে?

আবার ভাবলে, লেখাপড়া না শিখে সে পাড়াগেঁয়ে ছেলেগুলোর মত মূর্খ হয়ে থাকবে? না তা কখনই হবে না। ছেলের ওপর এ অত্যাচার মা হয়ে সে সহ্য করবে কেমন করে?

কিন্তু সে মুখে বললে—আচ্ছা তাই হবে, ঘুমো।

দুই

দু'দিন পরে নিশ্চয়ই রমেশবাবু এসে অলককে নিয়ে, যাবেন, এটা নিশ্চয় জেনে তার পরদিন কমলা একটা বড় তোরঙ্গে ছেলের জামাকাপড় গুছিয়ে রাখছিল।

অলক কোত্থেকে ঝড়ের মত ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে—এসব কি হচ্ছে মা? কি করবে এগুলো?

একটা জামা ভাঁজ করে বাক্সে তুলতে-তুলতে কমলা বললে—তুমি কোলকাতা যাবে, তাই সাজিয়ে রাখছি।

হ্যাঁ, আমি যেন যাব! ওসব সাজিয়ো-টাজিয়ো না বলছি, দেখবে সেদিন কি করব আমি!

কমলা তাকে সাদরে কাছে টেনে এনে চুম্বন করে বললে—ছিঃ বাবা, দুষ্ট ছেলের মত ওসব কি বলতে আছে? সেখানে দেখবে কত মজার জিনিষ আছে—কত কি! দু'দিন পরে ছুটি হলেই আসবে এখানে! আমার কথা শুনলে তুমি যা চাইবে তাই দেবো কেমন?

অলক একটু নীরব থেকে বললে—আমি যে একা আসতে পারব না সেখান থেকে।

—না রে বোকা ছেলে! একা কেন? তোর মামা গিয়ে নিয়ে আসবে যে!

অলক মুখ ভার করে বললে—হুঁ, মামা ভারী দুষ্টু, সে যদি না যায়, তখন?

কমলা একবার কি ভেবে চট্ করে বলে ফেললে—আমি নিজে যাব তা হলে।

কথাটা শুনে অলকের মুখে হাসি ফুটল। বললে—এঃ মিছে কথা। না গেলে কিন্তু ছুটে পালিয়ে আসব বলে দিচ্ছি!

—আচ্ছা তাই আসিস। বলে কমলা তার কচি গালে আর একটি চুমো দিয়ে বললে—লক্ষ্মী বাবা আমার!

অলক এবার হাসিমুখে দমকা বাতাসের মতই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দুই পরে আবার ফিরে এসে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল—সেই যে সিল্কের পোষাকটা আমায় পরতে দাও না মা, সেটা দিতে হবে কিন্তু!

—আচ্ছা!

বলে কমলা নিজের কাজে মন দিলে।

সংযমের বাঁধন ঠেলে দুই ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু কখন যে তার চোখের কোণে এসে জমেছিল, তা সে জানতে পারে নি। অলক চলে লেগে, টস্ টস্ করে দুটি শিশির-কণার মতই গণ্ড বেয়ে তা ঝরে পড়ল। সন্ত্রস্তে অঞ্চল-প্রান্তে না মুছে ফেলে সুমুখে তাকাতেই দেখলে, অমরেশ একটা হলুদ রঙের চিঠি হাতে দিয়ে ত্রস্তপদে সেই দিকে আসছে। জিজ্ঞাসা করলে, খবর কি?

অবিনাশ হাতের খামখানা দেখিয়ে বললে—টেলিগ্রাম করেছেন, তিনি কাল সকালেই আসবেন।

বেশ তো, আমিও এদিকে সব ঠিক করে' এসেছি। বলেই কমলা বাক্সট. বন্ধ করে উঠে গেল।

কেমন করে কি ভাবে কাল বিদায়ের পালাটা এসে দেখা দিবে, শুধু এই কথাটাই সমস্ত দিন ধরে কমলার মনে ঘোরা ফেরা করতে লাগল। অমরেশ মুখে কিছু না বললেও তারও মনটা যেন এই কথাটা স্মরণ করে বিষন্ন হয়ে পড়ছিল।

অমরেশ কমলাব মনের অবস্থাটা লক্ষ্য করে বার বার ভেবেও কোনরূপ কূল-কিনারা পাচ্ছিল না। এই দুর্বল নারীর আত্মদমনের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সে আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারছিল না।

অবিনাশ ভেবেছিল, বুঝি-বা কমলা এ কথা শুনে কেঁদেই আকুল হবে, কোনপ্রকারেই অলকে ছাড়তে চাইবে না।

কিন্তু কথাটা তার কাছে প্রকাশ করা অবধি অমলেশ কমলার গতিবিধি লক্ষ্য করেও কোথাও তার এতটুকু দুর্বলতা দেখতে পাচ্ছিল না। এটাই তাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করেছিল। আবার একবার নিজের মনের আঘাতের ভেতর দিয়ে তাকে বিচার করতে গিয়ে সমস্তই গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে বিদায়ক্ষণ এসে পড়ল। রমেশবাবু পরদিন প্রত্যুষেই ভিনগাঁয়ে এসে অলককে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় কমলা অলককে হাত ধরে চুমা খেয়ে আদর করে শুধু বলে দিল, ভাল হয়ে' থেকো বাবা, আর যেমন পার, মাঝে মাঝে চিঠি লিখো।

অলকের জ্যেঠার সঙ্গে ষ্টেশনের রাস্তায় তাঁদের কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে অমরেশ বাড়ী ফিরতেই দেখলে, কমলা ঘরের মেঝের উপর চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে কান্না জুড়ে দিয়েছে। অবিনাশ মনে মনে এইটাই আশঙ্কা করছিল। ধীরে ধীরে কাছে এসে বললে—তাই তো বলি, এখনও চুপ করে' আছ যে!

কমলা ভারি গলায় উত্তর দিলে—যাও, আর জ্বালিও না।

কিছুক্ষণ পরে কমলা উঠে বসে বললে, ওরা এতক্ষণ কতদূর যাবে?...গড়ের পুকুরটা পেরিয়েছে,...না?...আমার কি মনে হচ্ছে জান? ওরা বোধ হয় ছেলেটাকে আর পাঠাবে না।

অমরেশ জোর করে মুখে হাসি এনে বললে—দূর পাগলী!

তার পর সত্য সত্যই দূর ভবিষ্যতের এমনি একটা আতঙ্কের কথা ভেবেই উভয়ে সেই নিস্তব্ধ ঘরের ভেতর চুপ করে বসে রইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কমলা কি একটা শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে

বলে উঠল, ঐ—ঐ কল্‌কাতা যাবার গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে,—শোন্ !

অমরেশ সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে না পাঠায়, আমি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসব, কি বল কমল !

অমরেশ তাকে কমল বলেই ডাকত।

কমলা তখনও উৎকর্ণ হয়ে গাড়ীর শব্দ শুনছিল, অমরেশের কথা-গুলা ভাল করে শুনতে পায়নি, তাই প্রশ্ন করলে—কি বল্লে ?

অলককে তারা না পাঠায়, আমি নিজে গেলে নিশ্চয়ই—

কথাটা শেষ হবার পূর্বেই কমলা উৎসুকভাবে বললে—পারবে তো ?

কেন পারব না ?

বেশ, বলে কমলা সেখান থেকে উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

এদিকে সেই দিনই সন্ধ্যার সময় জ্যেঠার সঙ্গে অলক কলকাতায় এসে দেখলে, বড় বড় রাস্তার ওপর নানারকমের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী। রাস্তার দুই ধারে আলোকোজ্জ্বল দোকানের সারি, গাড়ি-ঘোড়া লোকজন দেখে তার বিস্ময়ের আর সীমা হইল না ! পথের পাশে লাইনের ওপর দিয়ে সারি সারি ট্রাম-গাড়ী ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটছিল। এ রকম অদ্ভুত গাড়ী সে জীবনে কখনও দেখেনি, তাই এক একবার মনে হচ্ছিল, জ্যেঠার কাছে জিজ্ঞাসা করে সমস্ত জেনে নেয় ; কিন্তু এই সদ্য পরিচিত গম্ভীর প্রকৃতির লোকটিকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হচ্ছিল না। নির্বাক বিস্ময়ে এই সমস্ত দেখতে দেখতে মোটর গাড়ীটা রমেশবাবুর বাড়ীর ফটকের কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, এইবার নাম্‌তে হবে !

অলক স্বপ্নাবিষ্টের মত তাঁর হাত ধরে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল। সুসজ্জিত বাড়ীটার প্রত্যেক জিনিসই তার বড় অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বাইরের কোলাহল যার কানে এসে বাজতেই এক একবার মনে করছিল, দৌড়ে গিয়ে আগে বাইরের

সমস্ত জিনিস ভাল করে দেখে তারপর ভেতরে যাবে। কিন্তু কাজে কিছুই করতে পারলে না; ধীরে ধীরে অন্যমনস্কের মত চলতে চলতে ভবতে লাগল, মা কি বোকা, সে সঙ্গে এলো না কেন।

জীবনে হয় তো সে এ-সব কখনও দেখেনি—না এলে দেখতেও পাবে না।

ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে চমকে দেখলে ঠিক তার মায়েরই মত একটি স্ত্রীলোক সহাস্যে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিতে আসছেন। অলক বাধা দিলে না। সে তাকে কোলে তুলে সাদরে চুম্বন করে বললে—আমি যে তোর মা হই রে অলক, চিনতে পারিস? অলক ভাল করে রমণীর সুন্দর হস্যোজ্বল মুখখানির দিকে চেয়ে দেখতে লাগল—সত্যই এ-ই তার ভিনগাঁয়ের মা নয় তো?

অলকের পোর্টমেণ্টটা মোটর থেকে নামিয়ে নবনিযুক্ত হিন্দুস্থানী চাকর রামা তার মাথায় তুলে তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছিল তাঁদের দাঁড়াতে দেখে রামা সেই গুরুভার মস্তকে নিয়ে প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ রমেশবাবু তা দেখতে পেয়ে বললেন, কোথাকার হাঁদা গঙ্গারাম রে তুই! ওটা ঘরের ভেতর নামিয়ে রাখ গে যা।

রমেশবাবুর গৃহিনী রমা এতক্ষণ অলককে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করবার সময় তার ছিল না! এইবার মুখ ফিরিয়ে দেখে সে বললে—ওটা বুঝি অলকের সঙ্গে এসেছে?··· আয়, আমার ঘরে রাখবি আয়।—বলেই সে অলককে কোলে নিয়ে আগে আগে চলল। অলক নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, কাজেই এতক্ষণ ধরে কোলে চড়ে থাকতে তার লজ্জাবোধ হচ্ছিল। রমা ঘরে ঢুকতেই সে কোল থেকে নেমে পড়ল।

রামা ঘরের এক কোণে তোরঙ্গটা নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল,

রমা বললে, ঝিকে ডেকে দিস্ তো বাবা! ছেলে সমস্তটা দিন টেনে এসেছে—কিছু খাওয়া হয় নি!

অলক একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। রামা চলে গেলে রমা পুনরায় আদর করে তাকে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলে ক্ষিদে পায় নি রে?

অলক ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে,

বিছানা-পাতা তক্তাপোষের ওপর তাকে বসিয়ে রমা আবার বললে, বাক্সটা বুঝি আসবার সময় মামী-মা সঙ্গে দিয়েছেন?

অলক বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বললে, ওইটা তো? হ্যাঁ, মা দিয়েছে আসবার সময়।

রমা বুঝল, অলক তার মামী-মাকে 'মা' বলেই জানে। সে তাকে আরও কোলের কাছে টেনে এনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে, আসবার সময় তোমার মামা কি বললেন?

উত্তর দেবার আগে অলক ভাবছিল, আসার সময় মামা কি বলেছিলেন; এমন সময় দরজার নিকট ঝি এসে ডাকলে, আমায় কি বলছিলেন মা?

ও-ঘরে খাবারের থালা সাজিয়ে রেখেছি নিয়ে এস।

ঝি চলে গেলে বললে, কিছু বলেননি, না রে? অলক ঘাড় নেড়ে বলাল, না।

তুই আর যেতে পাবি নে সেখানে। এই ঘড়বাড়ী সব তোরই। বলে, রমা আবার তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। এত বুকের কাছে টেনে এনেও, এত ভালবেসেও তাঁর অতৃপ্ত ক্ষুধা যেন আর মিটতে চায় না!

অলক হঠাৎ এই প্রচণ্ড ভালবাসার মধ্যে এসে পড়ায় যেন কেমনতব আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল, ভাল করে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না।

রমা তখনও তাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নিজের বুভুক্ষু

ভালবাসাটা শান্ত করছিল। সেও নিতান্ত নিরুপায়ের মত তারই কোলের ওপর কাৎ হয়ে পড়ে ভাবছিল কে এ? কেন এমন করে? তার এই উদ্দাম ভালবাসার প্রচণ্ডতা; অলক যে অনুভব করছিল না তা নয়, তবু এই তরুণীর মুখে-চোখে ভাবভঙ্গিতে কোথাও যেন এতটুকু রূঢ়তা বা কৃত্রিমতার সন্ধান না পেয়ে তার বালক হৃদয় সেই প্রচণ্ডতার মধ্যেও কেমন যেন একটু শান্তি অনুভব করছিল। তাই কলের পুতুলের মত রমা যা করাচ্ছিল কোনরূপ বিরক্ত না হয়ে তাই করে যাচ্ছিল।

অলক হঠাৎ দরজার দিকে তাকাতেই দেখাল কখন তার সেই সগুপরিচিত জ্যেঠাবাবু তাঁর রুক্ষ গম্ভীর মূর্তি নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রমা সেদিকে মুখ ফেরাবার আগেই রমেশবাবু বললেন, এরই মধ্যে খুব আলাপ হয়ে গেল দেখছি—কি কথা হচ্ছিল এতক্ষণ?

রমা মুখ না ফিরিয়েই বললে, ওকে বলছিলুম, সে আর ভিন-গাঁয়ে যেতে পাবে না—এইখানেই থাকতে হবে।

এর আগে এই কথাটা শুনে অলক তা বিশ্বাস করেনি। এইবার তার বুকটা একটা অজানা আতঙ্কে দুড়মুড় করে উঠল। ভাবলে, সত্যই কি সে আর ভিনগাঁয়ে যেতে পারে না? সেখানে তার মা আছে যে!

রমার কথাটা শুনে রমেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। সে কি অদ্ভুত হাসি! সমস্ত ঘরটা যেন মুহূর্তে কেঁপে উঠে আবার থেমে গেল! সে বিকট অথচ সরল হাসির প্রতিধ্বনি অলকের বুক-টাকে যেন সজোরে নাড়া দিয়ে একেবারে নিঃসাড় নিস্পন্দ করে দিল। রমেশবাবুর মুখের দিকে চোক ফেরাতেও তার কেমন যেন ভয় করছিল, তাই ভীত নিরীহ পক্ষীশাবক যেমন মাতার পক্ষপুটের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে অলকও তেমনি করে রমার বুকে আঁচলে মুখ ঢেকে মুষড়ে শুয়ে পড়ল।

রমা বুঝল, ঘরে পা দিতেও তর নেই, এরই মধ্যেই রমেশবাবু খানিকটা মদ গিলে ব্যঙ্গ রসিকতা করতে তাঁরই কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন! যে জিনিসটাকে এড়িয়ে চলবার জন্য এত সাধ্য-সাধনা, আবার ঘুরে ফিরে সেইটাই তার পায়ে পায়ে শৃঙ্খলের মত জড়াচ্ছে। এর চেয়ে জ্বালা আর কি থাকতে পারে? এ-সব রমার ভাল লাগছিল না, সে নিজের মধ্যেই বিভোর হয়ে একটা অপূর্ব্ব মধুর শান্তি অনুভব করছিল। তাই রমেশবাবুকে সেখান থেকে তাড়াবার জন্য বললে, তুমি যাও না বাপু এখান থেকে। নেয়ে খেয়ে একটু সুস্থির হয়ে বসোগে···

রমেশবাবু জড়িতকণ্ঠে বলে উঠলেন, বলিহারি যাই রমলা, আমার কথাটা যে ভুলে যাবে তা··

রমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। সে এতক্ষণ নীচু মুখেই কথা বলছিল, এইবার রমেলবাবুর মুখের পাণে একবার তাকাল।

চক্ষে তখন তার পরিপূর্ণ মাতৃত্বের মহিমময়ী স্নিগ্ধ সুকোমল দৃষ্টি। অন্যদিন হাজার অনুরোধেও যে-কাজ হয় না, আজ এই সামান্য দৃষ্টি টুকুতেই তা হয়ে গেল। রমেশবাবুর কথাটা আর শেষ হলো না—মাঝ পথে কোথায় যেন হারিয়ে আটকে গেল। রমার চোখের উপর চোখ পড়তেই তাঁর মনে হল, কে যেন সপাং করে তাঁর পিঠে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিল। তাঁর মদিরা-বিহ্বল চোখের প্রলুব্ধ দৃষ্টি আপনা থেকে অবনত হয়ে এলো। ঠিক যেমন ভাবে তিনি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তেমনিভাবেই নিঃশব্দে ধীরে ধীরে টলতে টলতে সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন।

তিন

হঠাৎ কোন্‌দিক দিয়ে যে কি হয়ে গেল, রমেশ কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। কেনই বা তাঁর এ দুর্বলতা, এবং কিসের ভয়ে তাঁহার মুখের কথাটা মুখেই বেধে গেল, এইরূপ কতকগুলো চিন্তা কেবলই তাঁর বিকৃত মস্তিষ্কে এলোমেলো ভাবে ফিরতে লাগল। এক একবার তাঁর রাগ হচ্ছিল অলকের উপর। ভাবছিলেন, ওই ছেলেটাই একটা মস্ত বাধার মতন তাঁদের মধ্যে এসে পড়েছে, তাকে না আনাই ছিল ভাল। আর তাতে তাঁরই বা দোষ কি? রমাই তো কেঁদে কেটে জোর করে তাঁকে ছেলেটাকে আনতে পাঠাল!

এই সব নানাকথা ভাবতে ভাবতে কোন্ সময় যে তিনি অন্যমনস্কের মত সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এসেছিলেন বুঝতেই পারেন না। উঠানের একপাশে একটা ছোট ঘর খালি পড়ে থাকত। মাঝে মাঝে বাগানের দিকের বড় জানালাটা খুলে দিয়ে তিনি এই ঘরটায় নির্জনে চুপ করে বসে থাকতেন। আজও কি ভেবে তিনি এই ঘরটায় গিয়ে আরাম কেদারাখানা ঘরের মেঝে থেকে হিড়হিড় করে জানালার কাছে টেনে এনে, অবসন্নের মত থপ্‌ করে তার ওপর বসে পড়লেন। গ্রীষ্মের উত্তাপে বাগানের ফুরফুরে হাওয়া তাঁর গায়ে মুখে এসে পড়ায় বেশ আরাম বোধ হতে লাগল, তাড়াতাড়ি জামার বোতামগুলো পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে ফেলে বুকটা ফাঁক করে ফেললেন। ধীরে সুস্থিরে একটি একটি করে বোতাম খুলবার মত মনের অবস্থাও তখন

তাঁর ছিল না। অর্ধশায়িত অবস্থায় কিছুক্ষণ চোখ বুজে হাই তুলে' অবশেষে ডাকলেন, ভজুয়া!

বাড়ীর মধ্যে হিন্দুস্থানী চাকর ভজুয়াই ছিল তাঁর একমাত্র বিশ্বাসী। তাই সময় অসময়ে তাঁর কোন কাজ পড়লে ডাক পড়ত তারই।

হুজুর বলতেই রমেশবাবু দেখলেন, তার পরিবর্তে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর দুই চক্ষের বিষ রামা খানসামা। বোমায় আগুন লাগলে তা যেমন মুহূর্তেই সশব্দে ফেটে যায়, রামাকে দেখেই তাঁর সর্বাঙ্গ যেন তেমনি ভাবে ফেটে জ্বলে উঠল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সরোষে চীৎকার করে বলে উঠলেন, পাজি, উল্লুক! তোকে ডেকেছি!

মনিবের চোখ-মুখের ভাব দেখে রামা সভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছিল।

রমেশবাবু বললেন, বেরো হারামজাদা, এখান থেকে—বেরো।

রামা সত্রস্তে সেখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আবার ডাকলেন, ওরে শোন্, ভজুয়া কোথায়?

হুজুর, সে তো এখানে—

নেই! আচ্ছা, একটা কাজ কর। আমার ওপরের ঘরে—

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। চেয়ারের হাত দুটো ধরে ওঠবার চেষ্টা বললেন—নাঃ. আমিই যাচ্ছি।

রমেশবাবু আবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু উঠতে পারলেন না: ওঠার ইচ্ছাও ছিল না। কাজেই পুনরায় রামার শরণাপন্ন হতে হল; বললেন, উঠতে পারব না—যা, তুই-ই নিয়ে আয়।

কি আনতে হবে জানতে না পেরে রামা দরজার কাছে তেমনি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রমেশবাবু সরোষে পুনরায় বলে উঠলেন—গেলি নে যে হতভাগা!

রামা আমতা-আমতা করে বললে—আজ্ঞে, কি আনতে হবে ?

মনিবের কঠিন শুষ্ক মুখখানায় দুর্লভ মণির মতই হঠাৎ হাসির রেখা ফুটে ওঠে, বললেন—ও, মালের বোতল চিনিস্ ?

রামা পূর্বে যে-মনিবের বাড়ী চাকরী করত, সেখানে তার এক সহকর্মী বন্ধুর কৃপায় মালের ইতিবৃত্ত সমস্ত জেনেছিল, তাই আজ সে কথাটা গোপন করতে পারলে না, করবার প্রয়োজনও ছিল না বললে, আজ্ঞে হাঁ, চিনি।

যা, তবে নিয়ে আয়।—কাঁচের গেলাসটাও আনতে ভুলিস্ না যেন।

ওপরের ঘরে গিয়ে রামা দেখলে, সুমুখের তাকের ওপর একটা বোতল রয়েছে। তাড়াতাড়ি সেটা হাতে নিতেই তার ইচ্ছা করছিল, এই সময় নিজেও একটু 'প্রসাদ' পেলে হয় না ? গ্লাস খুঁজবার অবসর তখন তার ছিল না। প্রথমে ঘরের আশে-পাশে একবার দেখে নিলে, কেউ আসছে কিনা, তারপর বিনা আপত্তিতে ছিপি খুলে, বাঁ হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে নিজের নাকটা বেশ করে টিপে ধরে, বোতলের মুখেই এক চুমুক খেল—ওয়াক্ !

রামা হাসবে কি কাঁদবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। এই অপূর্ব পদার্থটা পেটে যেতেই সে বুঝল, বাবুর গায়ে মাখবার তিলের তেল সে ভুলে এক চুমুক খেয়ে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি বোতলটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে মুখ ফেরাতেই দক্ষিণ দিকের তাকের উপর দেখল, আর একটা বোতল রয়েছে। বোতল ও ডিকেণ্টার গ্লাসটা তুলে নিয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতা ও অদৃষ্টকে দোষ দিতে দিতে সে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল। মুখের বিশ্রী ভাবটা পাছে মনিবের কাছে ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে বার-বার দাঁতে দাঁত চেপে যথাসধ্য চেষ্টা করতে করতে রমেশবাবুর সুমুখে এসে দাঁড়াল। জি, ঘোষের কাঁচা তিল তেলের কল্যাণে তখনও তার পেটের বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে উঠছিল। ভয় হচ্ছিল, এই রে, বুঝি বা মনিবের চোখের সুমুখেই বমি করে ফেলে !

উপর্যুপরি কয়েক গ্লাস মদ খেয়ে রমেশবাবু প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতই বোতলটা হাতে নিয়ে বসেছিলেন, এমন সময় উপর থেকে রমা ডাকল রামা, রামা,—ভজুয়া ! বাবুর এখনও স্নান হয় নি, খেতে হবে না বুঝি !

রামা তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। রমার কণ্ঠস্বর শুনে তার অত্যন্ত ভয় হল ! ভাবলে, মা'-জীর নিষেধ স্বত্বেও সে-ই তো উপর থেকে মদের বোতলটা বাবুর কাছে এনে দিয়েছে ! একথা না শুনলে তার চাকরী যাবে ! এই ভেবে রামা কোনরূপ সাড়া-শব্দ না করে ধীরে ধীরে চোরের মত দরজার আড়াল দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

অনেক ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া না পেয়ে রামা নিজেই নীচে নেমে এসে সেই ঘরটার সুমুখে যেয়েই হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে গেল। দেখল রমেশবাবু হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন—হাতে মদের গ্লাস টেবিলের উপর বোতল, আর বিশ্রী গন্ধে চারদিকটা ভরে গিয়েছে। রমার ইচ্ছা করছিল নাকে কাপড় দিয়ে সেখান থেকে সরে যায়। কিন্তু তা পারলে না। জোরে জোরে রমেশবাবুকে শুনিয়েই বললে, হ্যাঁ গা তুমি কাণ্ডটা কি করছ ? সকাল থেকে আবার মদ নিয়ে বসলে, ছি !

রমেশবাবু ধীরে ধীরে মাথাটা তুলে রক্তবর্ণ চোখদুটি ফিরিয়ে বললেন, কে রমলা ? বলি, বাইজীর এত টান কবে থেকে !

কোথায় যেন আহত হয়ে রমা স্তব্ধভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। চলে যেতে পারল না, মুখ দিয়ে কোন কথাও বের হল না।

রমেশ টেনে টেনে আবার বলতে লাগলেন, এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে ! দর্জিপাড়ার কথাগুলো কিছুই মনে নেই !

এবার রমা দৃপ্তস্বরে বলল, না, কিছুই ভুলিনি।

তবে !

তবে কি !

এস না এইদিকে একবার !

না, আর যেয়ে কাজ নেই।...বলি, কিছু খেতে হবে না মদ খেয়ে 'দিনটা কাটবে !

রমেশবাবু এইবার চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, এইতো বেশ খাওয়া চলছে রমলা, এসই না, দুটো কথা কইতেও দোষ ?

রমা ধীরে ধীরে বলল, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় আর রমলা বলে ডেকো না। আমি ওখানে যাবো না বাড়ীতে ছেলে রয়েছে আর তোমার এমনি মাতলামী করতে লজ্জা করে না ?

না, লজ্জা আবার কবে থেকে শিখলে রমা।···একটু থেমে ডাকছি। শোন, কাছে এসে বস।

তুমি থাক এইখানে, আমি চল্লুম। বলে রমা চলে যাচ্ছিল পুনরায় ডাকলেন, রমা !

রমা দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কি ?

ছেলেটাকে কাল দিয়ে আসব।

রমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে কাকে ? অলককে ?

হাঁ।

রমা একটু থেমে বললে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব তাহলে।

রমেশবাবু সরোষে বললেন, যেতে হয় যেও, তার জন্যে আমি আর তোমার পায়ে ধরে তোষামোদ করতে পারি না।

আচ্ছা, বলে রমা সেখান থেকে সবেগে চলে এলো। আজ তার মনটা, সারা দুনিয়ার এই পুরুষ জাতটার উপর ঘৃণায় ভরে উঠতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, জগতে পুরুষগুলো আসে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এবং তারই জন্যে জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাপ-পুণ্যের বিচার না করে অত্যাচার সইবার জন্যেই নারী জাতটার জন্ম। রমা একবার ভাবলে, চীৎকার করে এই মাতালটাকে শুনিয়ে দেয়, ওগো এই পাষাণের বুকে কত ব্যথা তা তুমি কেমন করে জানবে নিষ্ঠুর ! তুমি যে পুরুষ !

চার

কামিনীর মা, মায়ের মা, তার মা, এমনি করে বংশানুক্রমে আজ কত বৎসর ধরে যে তারা কলিকাতা শহরে বারবণিতায় কুৎসিত ব্যবসা চালিয়ে আসছে, তার ইতিহাস কামিনী নিজেই জানে না। কামিনীর বয়স যতই উপর দিকে বেড়ে চলতে লাগল, রূপের জৌলসটা দিন-দিন ততই নীচের পর্দায় নেমে পড়ছিল। তবু কোন রকমে সাবান মেখে সাজগোজ করে, রং-এর উপর রং লাগিয়ে পেটের দায়ে রোজ সন্ধ্যায় বারান্দায় এসে বসে আর ভাবে, একটা মেয়েও তো হলো না, বুড়ো বয়সে খাবে কেমন করে?

অবশেষে একদিন উপায় মিলে গেল। সংক্রান্তির দিন কালী ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে, একটি বছর পাঁচ ছ'য়ের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরল। গরীবের মেয়ে, কি জানি, কার সাথে গঙ্গাস্নানে এসেছিল, গোলমালে পথ হারিয়ে কামিনীর আশ্রয় নিলে। মেয়েটি নিজের নাম ভিন্ন আর কিছুই বলতে পারলে না। নাম ছিল তার রমলা। কামিনী পাড়া-পড়শী সকলকে জানালে, রমলা সম্পর্কে তার বোন-ঝি হয়। বোন মারা গেছে, তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে এলো নিজের কাছে রেখে মানুষ করবার জন্যে। তাদের মধ্যে দু'-একজন এমন মন্তব্যও প্রকাশ করলে, আহা বেশ মেয়ে, তোর পড়তি বয়সের একটা পন্থা হলো যাহোক্!

রমলার বয়েস বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে রূপও বাড়তে লাগল। কামিনী বুড়ো বয়সের মনের সাধ মেটাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করল

না। রমলা সামান্য লেখাপড়া শিখে সভ্য-ভব্য হবে ভেবে কামিনী তাকে নাম লুকিয়ে স্কুলে পাঠাতে লাগল। মেয়ে স্কুলে পড়ে ভদ্রলোকের মেয়েদের সাথে মিলে মিশে বন্ধুত্ব করে ক্রমে রমলার মনেব পরিবর্তন হতে লাগল। রমলা বেশ্যার বাড়ীতে থাকে এবং তারাই যে তার আপনার জন, এ কথা সঙ্গীদের কাছে সে ভুলেও কোনদিন মুখে আনত না। যতক্ষণ সে স্কুলে থাকত, ততক্ষণ বেশ থাকত, বাড়ী ফিরেই আপন মনে চুপ করে একটা বই নিয়ে জানালায় বসে পড়ত। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশতে তার ভাল লাগত না, কাজেই কারও সঙ্গে রমলার আলাপ পরিচয়ও ছিল না। তারাও তাকে দেখে ভুরু কুঁচকে সরে পড়ত, গা-টিপে হাসত। বলত বাপস্, ভারী তো রূপ, তারই দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না মেয়ের! দেখাই যাবে লো, ওই ফেটে পড়া রূপ নিয়ে তুই কত রোজগার করিস! রমলা সে-সব কথায় কান দিত না। বিকাল থেকে যত-সব ইতর, অভদ্র, মাতাল পাড়াময় ঘুরে বেড়াত। পড়শী মেয়েরা তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ রহস্য করত, যাচাই করত, দালাল ঘুরত, নাচত, বাজাত, আবার কেউ কেউ মদ খেয়ে যে-সব বীভৎস ব্যাপার আরম্ভ করত তা দেখে শুনে মনে হত, এই মুহূর্তেই সে এই নরক ছেড়ে তার সহপাঠিনী মেয়েদের কাছে চলে যায়, কিন্তু ভয়ে তাও পারত না। আর এ কথাটাও মনে হত যে, এসময় বাড়ীর বের হলে তারাও গোপন কথাটা জেনে ফেলবে।

কাজেই চোখ-বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া তার অন্য উপায় ছিল না।

কামিনী এ-সবের কিছু খবরই রাখত না। সে কেবল তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নের প্রাসাদের পর প্রাসাদ বয়েস্তরে-স্তরে গেঁথেই চলেছিল। সে জানত না যে, যাকে পেয়ে তার এই আশা-আকাঙ্ক্ষা, সে দিন-দিন তাদের নারকীয় বীভৎসতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে চলেছে।

কামিনীর চোখ ফুটল সেদিন, যেদিন সে তার প্রথম উদ্যম বাধা পেয়ে ফিরে এলো। রমলার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে মেয়েস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। তার বয়স তখন আঠারো অতিক্রম করতে চলেছে। অপূর্ব ফুল-সম্ভার নিয়ে যৌবন তখন তার সারা অঙ্গে নবীন-বসন্তের আগমনী জানিয়েছে। কোন্ নব প্রভাতে রমলা নিজেও এই বসন্তের জাগরণ অনুভব করছিল বটে, কিন্তু বে ভেবেছিল, এ পিশাচ পুরীতে সুন্দরের আগমন কেন? এই নরকের মাঝে তার এমন কি সম্পদ আছে, যা দিয়ে সে এই নবীন অতিথিকে বরণ করে নিতে পারে! এ বরং না এলেই ছিল ভাল। প্রেত-পুরীর দাপাদাপিতে এ তো টিকতে পারে না। অকালে মুকুল ঝরলে—ফুল খসবে, ফল ধরবে না, নিষ্ঠুর পদাঘাত-লাঞ্ছনায় এ সুন্দরকে ফিরে যেতে হবে। মাগো, এর চেয়ে বড়ং যন্ত্রণা আর কি আছে। এই জাগ্রত কল্যাণকে যুক্তকরে নমস্কার করতে গিয়ে তার দুই চোখ জলে ভরে এল।

সেদিন রাত্রে সে বিছানায় শুয়েছিল. কিন্তু ঘুম আসে নি। শুয়ে শুয়ে শুনল, কে একটা লোক জুতা পরে তাদের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। কামিনী বাইরে বারান্দায় বসে আছে জেনে রমলা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলে না। এমন তো রোজই আসে যায়। মাতালটা দুই-তিনবার পড়তে পড়তে দেওয়াল ধরে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ওপরে উঠল।

বাইরে বারান্দায় কামিনী একটা চেয়ারে, রেলিং এর গয়ে হেলান দিয়ে বসেছিল, চেয়ার ছেড়ে তাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করে বলল, এসো। পরক্ষণেই তার পাশের লোকটির দিকে নজর পড়তেই বললে এসেছ কেদার? বেশ বেশ। বলে একটা গর্বের হাসিতে তার মুখখানা একটু দীপ্ত হয়ে উঠল।

এই কেদার লোকটি খর্বাকৃতি, চোখ দুটো ঘোর লাল, মস্ত এক-জোড়া গোঁফ, পাক্ খেয়ে খেয়ে বুখের ভেতর এসে ঢুকেছে, গায়ের

রংটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বিশেষ কোন কাজ না পড়লে তাকে জামা-জুতা পরতে দেখা যায় না, কিন্তু পরনের ধুতির ওপর কোমরে একটা রঙিন ডোরাকাটা গামছা দিবারাত্রি জড়ানো থাকত। সে দালালি করে, নাচেব দলে ডুগি-তবলা বাজিয়ে জীবিকা-নির্বাহ করে; সব বাড়ীতেই তোষামোদি করে, দুই-একটা লোক ডেকে যখন-তখন অনবরত যাওয়া-আসা করে—তাই কেদারকে চিনে না, এ পাড়ায় এমন লোক খুব কম।

রমলাও তাকে ভাল করে চিনত। সেইজন্য কামিনীর মুখে কেদারের নামটা শুনে সে একটু চমকে উঠল। তারপর, তারা তিনজনে মিলে ফিস্‌ফিস্ করে কত কি বলাবলি করল, সে কিছুই শুনতে পেল না।

কিছুক্ষণ পরে জুতোর শব্দে রমলা বুঝল, আগন্তুক তারই ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে রমলা যেমন দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাবে, অমনি সে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে একেবারে টলতে টলতে রমলার গায়ের ওপর পড়ে তার আঁচলটা খপ করে ধরে ফেলল। লোকটা মদ খেয়ে চুর হয়েছিল, হাসতে হাসতে বললে,—সেলামীটা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে বাবা! ইস্।···

রমলার বুকটা দুড়দুড় করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তেই আত্মহত্যা করে মরে। কোনরকমে জোর করে আঁচলটা টেনে নিয়ে রমলা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখলে, কামিনী কেদারের সঙ্গে কথা বলছে। বললে, একি কাণ্ড মা মাতালটাকে এক্ষুনি বের করে দাও, নইলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব আমি।

অনেক করেও রমলাকে কোন প্রকারেই এই সহজ সরল তথ্যটা বুঝতে না পেরে কামিনী বললে, কেদার ডাক তো ভাই ওকে, কাল আসতে বলে দি।

মাতালটার হাত ধরে ঘর থেকে বের করে আনবামাত্র রমলা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজায় খিল এঁটে দিল।

পাঁচ

রমলা দরজা বন্ধ করে নিজেকে রক্ষা করলে বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ বালিশের উপর মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে থেকেও ঘুম এল না। কিছুক্ষণ পরে কামিনী বাইরে থেকে দরজার ঘা দিয়ে বললে, ঘুমিয়েছিস রমলা, আমি শুতে যাচ্ছি। কথাটা শুনেও রমলা চুপ করে রইল। কোন সাড়া না পেয়ে কামিনী চলে গেল। রমলা ধীরে-ধীরে বিছানা থেকে উঠে পাশের জানালায় গিয়ে বসল। উত্তরদিকের এই জানালাটা রমলা ইচ্ছে করেই বন্ধ করে রাখত কারণ সে জানত পাশের বাড়ীতে আজ কয়েক মাস ধরে কয়েকজন স্কুল-কলেজের ছাত্র একটা 'মেস' করেছে এবং এই জানালাটা খুললে সুমুখের জানালা দিয়ে পাশের ঘরের প্রত্যেক জিনিষটাই দেখতে পাওয়া যায়। এই দুটি পাশাপাশি বাড়ির মধ্যে মাত্র একটা সঙ্কীর্ণ গলি ভিন্ন আর কিছুই নেই—মোট কথা, বাড়ী দুটো পরস্পর গা ঘেঁষে উঠেছিল। রমলা আজ এমনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল যে তার মনে হচ্ছিল, এই অন্ধকারে লুকিয়ে কামিনীর বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথও চলে যায়, কিন্তু তা হলেও তো নিস্তার পাবে না! তার রূপ-যৌবন তো সঙ্গেই যাবে! খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে, কি ভেবে, রমলা জানালাটা খুলে ফেলতেই পাশের ঘরের ইলেকটিক্ আলোর ছটা খোলা জানালার পথ দিয়ে তার অন্ধকার ঘরে এসে পড়ল। রমলা দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করে একজন যুবক তক্তাপোশের উপর বসে নিবিষ্টমনে একখানি বই পড়ছে। তার এত কাছে এই অপরিচিত যুবককে

দেখে তার লজ্জা হলো। এক একবার মনে করছিল জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে দূরে সরে যায়, কিন্তু তাও পারলে না—মুখোমুখি হয়ে জানালায় বলে থাকল। রমলা ভাবছিল, তার আবার লজ্জা কি? এই লোকটিকে বললে, তিনি যদি দয়া করে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারেন। কেমন করে কি ভাবে ভদ্রতা রক্ষা করে তাঁকে কথাগুলো বলতে হবে, সে অনেকক্ষণ ধরে তাই ভাবল—কিন্তু মনে হতে লাগল কে যেন তার গলাটা চেপে কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে।

বলি-বলি করেও যে কথাটা রমলা আধঘণ্টা ধরে বলতে পারছিল না,—নিমেষেই কেমন করে যে সে কথাটা বলে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে না।

রমলা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ডাকলে,—শুনুন!

যুবক মুখ ঘুরিয়ে সুমুখ জানালার পাশে রমলার সুন্দর মুখখানা দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে বললে, কে?

রমলা এ কথার কি উত্তর দেবে কিছুই বুঝতে পারলে না। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে আবার বললে শুনুন!

যুবক জানালার কাছে সরে একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, কে আপনি? কি বলেছেন!

যুবকের সুন্দর মুখখানার দিকে দৃষ্টিপড়তেই, রমলা এতক্ষণ ধরে যে-সব কথা বলবে ভেবেছিল, সমস্তই ভুলে গেল; বললে আপনার নাম কি?

আমার নাম অনিমেষ রায়।

রমলা বললে, আপনার বাড়ী কি এইখানে?

আজ্ঞে না, আমার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূর—ভিন্ গাঁ। আমি নতুন কল্‌কাতায় এসেছি বি, এ, পড়বার জন্যে। এটা আমাদের মেস। আপনি—

হ্যাঁ, আপনি দয়া করে যদি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন—আপনার দেশে হোক্, যেখানে হোক একটা ঝি-এর কাজ টাজ—

যুবক বিস্মিত হয়ে বললে কেন ?

আমার এটা বাড়ী নয়—বাড়ী বল্‌তে কোথাও নেই-ও। এরা আমায় ধরে নিয়ে এসেছে। এটা একটা বেশ্যার বাড়ী, তা বোধহয় আপনি জানেন।

কথাটা শুনে যুবক ভ্রূ-কুঞ্চিত করে নীচের জানলাটা বন্ধ করতে করতে বললে, না, তা জানি না। তবে কিনা, আমার দ্বারা ও-সব কাজ হয়ে উঠ্‌বে না—আপনি যান। বলে, আর ক্ষণবিলম্ব না করে অনিমেষ তাড়াতাড়ি ওর মুখের উপর জানালা বন্ধ করে দিলে।

রমলা বন্ধ জানালাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অনেকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। নিমেষেই কি যে একটা ব্যাপার হয়ে গেল, নিজেই তা ভাল করে বুঝতে পরিছি না। ভাবলে জানালার লোহার শিকে মাথা ঠুকে, এই লোকটির চোখের সুমুখে নিজের মাথাটা শতধা বিচূর্ণ করে সব শেষ করে ফেলে।

ওগো বিদ্বান ! ....রমলায় রাগ হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, হয় নিজের মাথাটা এমনি করে ভেঙে ফেলে, নয়, ওই বড় বড় ন্যায় ও দর্শনের ইংরাজী কেতাবগুলো ছুঁড়ে এই পাষাণের মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেয়।....না, না, তারই বা দোষ কি ?—রাগে অভি-মানে রমলার চোখ দুটো জলে ভরে এলো। নিজের ভবিষ্যতের বীভৎস চিত্রটা সে যেন চোখের যামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। নারী যে এত বড় নিঃসহায় ও দুর্বল হতে পারে, এ-কথা সে এ কদিনের তরেও ভাবেনি। আজ তার এই অন্ধ সংস্কার ভেঙে যাচ্ছিল। তার যা খুশী সে তাই করবে—তার সংসার নাই সমাজ

নাই, ন্যায় নাই ধর্ম নাই, ভবিষ্যৎ নাই। প্রাণের সত্য বজায় থাকলে কি মিথ্যায় বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে যাবে না? কে বলে দেবে? হা ভগবান!

ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে এসে রমলা বিছানায় পড়ে কাঁদতে লাগল।

রমেশবাবু তেইশ বৎসর বয়সে দেশ ছেড়ে পড়বার জন্য কলকাতা এসেছিলেন, যেই অবধি আর দেশে ফেরেন নি। না ফিরবার কারণও ছিল। প্রথমতঃ এসেছিলেন পিতামার মৃত্যুর পর, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে। দ্বিতীয়তঃ পিতা এমন কিছু সম্পত্তি রেখে যাননি, যার অংশের দাবী করবার জন্যে রমেশবাবুকে দেশে যেতে হবে। নগদ আটশত টাকার মধ্যে, নিজের, অংশের চারশ ভাইকে দিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন। পিতার জীবিতাবস্থায় তাঁর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু বিবাহের পর আটদিন পার হতে-না হতেই পত্নী-বিয়োগ হয়। তিনি নিজে আর বিবাহ না করে ছোট ভাইয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন। কাজেই দেশের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেছে ভেবে, কলকাতায় এলেন লেখাপড়া শেখবার জন্যে। আসলে কিন্তু লেখাপড়া কিছুই হল না। কলকাতায় এমন কতকগুলি মধুলুব্ধ বন্ধু জুটে গেল, যাদের কল্যাণে রমেশবাবুর একমাত্র অবলম্বন চারশ টাকা রেস খেলার অপার মহিমায় এক মাসের মধ্যেই কোন্ দিকে উড়ে গেল।

টাকাগুলো হাতছাড়া হবার পর, তিনি যখন দেখলেন যে তাঁর বন্ধুরাও সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়েছে, তখন নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ হল বটে, কিন্তু এ-সময় আবার অনুতাপ হলেই বা রাখবে কে? উপায়ান্ত নাই দেখে ভাবলেন, দেশে ফিরে যাবেন, কিন্তু

ভাইয়ের উপর অভিমানের জন্যেই হোক, বা কলকাতা নগরীর মায়া পরিত্যাগ করতে না পেরেই হোক, তিনি কোনমতেই দেশে যেতে পারলেন না।

যা স্বপ্নেও ভাবেন নি তাই হল। কোনদিন একবেলা খেয়ে কোনদিন বা না খেয়েই এখানে-ওখানে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু কার কোন্ সময় কি ভাবে ভাগ্য পরিবর্তন হয় কেউই বলতে পারে না। অবশেষে একদিন তিনি এক ধনী বেশ্যার সুনজরে পড়ে গেলেন। তার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে তিনি চিৎপুর রাস্তার উপর একটি ছোট-খাটো ব্যবসা আরম্ভ করলেন। ব্যবসার উন্নতি হল। হাতে কিছু টাকা হলে বৌ-বাজারে একটা বাড়ী ভাড়া করে পাটেও দালালি আরম্ভ করলেন। এইরূপে বছর চারেক পরে রমেশবাবু দেখলেন, তাঁর অবস্থা বেশ ফিরে গেছে। কিন্তু তিনি বদ অভ্যাসগুলির একটিও ছাড়তে পারেন নি। ব্যাপারটা অতি সংক্ষেপে এইরূপ।

সে দিন কলকাতা শহরে ভয়ানক বৃষ্টি। রাস্তার ওপর যেখানে সেখানে জল দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে থেকেই আকাশটা আবার মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে এলো। মেঘ গর্জন করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও আরম্ভ হল। দর্জিপাড়ার এক বারবণিতার গৃহে রমেশবাবুর বর্ষা-বাসর বেশ জমে উঠেছিল। একটা তাকিয়ার ওপর কাৎ হয়ে পড়ে মদিরাবিহ্বল নেত্রে তিনি বাঈজীর মুখের পানে তাকিয়েছিলেন। সে হারমোনিয়াম নিয়ে পাশে বসে গাইছিল,—

"যাহা চাহ সখা দিব ফিরাইয়া
স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না।"

হঠাৎ হুইস্কির বোতলটার দিকে নজর পড়তেই রমেশ বাবু দেখলেন বোতলটা খালি হয়ে গেছে, তাতে এক ফোঁটা মদ নেই। তিনি তাকিয়াটা পাশে সরিয়ে দিয়ে উঠে বললেন—তোমার ঘরে আর মদ নেই বাঈজী?

গান বন্ধ করে সে বললে, আবার মদ? যা ছিল, তুমিই তো কাল সব শেষ করে গেছ আমি আর কোথা পাব?

হাতে- বাঁধা সোনার ঘড়িটার পানে তাকিয়ে রমেশবাবু বললেন—উঠতে হলো দেখছি, মদ আনতেই হবে।

বাঈজী বললে—তুমি অনর্থক এই বৃষ্টিতে ভিজে কেন যাবে রমেশ বাবু, বেয়ারা পাঠিয়ে দিলেন চল্‌বে না।

রমেশবাবু সোজা হয়ে উঠে বসলেন,—আটটা বেজে গেছে, সে হয়তো আনতে পারবে না।

রাস্তায় এসে তিনি দেখলেন, টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়ছে এবং পথে জল জমেছে! জুতো দুটো সেখানেই খুলে ফেলে পথে নেমে পড়লেন। হাঁটুর কাপড় তুলে, জলের উপর দিয়ে অতিকষ্টে কিছুদূর যেতে না যেতেই ভয়ানক বৃষ্টি নামল। গলির মোড়ে একটা বাড়ীর রকের উপর রমেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। উপর থেকে রমণীর কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল, বেরিয়ে যাও, নইলে তোমার মাথায় উপর এই মদের বোতল ভেঙে ফেলব।

মাথার উপর কেন বাবা, আমার মুখের উপরে ভেঙে ফ্যাল, পেটে চলে যাক্। বলতে বলতে রমেশবাবু সুমুখের সিঁড়ি ধরে সেই অপরিচিত বাড়ীটার ওপর উঠে গেলেন। বাড়ীটা অপরিচিত··· হলেও রমেশবাবুকে চিনত না, এরূপ লোক দর্জিপাড়ার খুব কমই ছিল। তারপব মদের বোতলের কথাটাই তাঁকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে গেল। বৃষ্টির জন্য সুমুখের রেলিং দেওয়া বারান্দাটার চারপাশে নীলরঙের চিকের পর্দা টেনে নেওয়া হয়েছিল এবং দেওয়ালের উপর একটা বাতি মিটমাট করে জ্বলছিল। রমেশবাবু দেখলেন একটা দরজার পাশে একজন মাতাল প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে—গায়ের আদ্দির পাঞ্জাবিটা শতচ্ছিন্ন হয়ে ভেতরের রঙিন গেঞ্জিটা বের হয়ে পড়েছে। একদিকে একটা টেবিলের পাশে এক যুবতী সদর্পে দাঁড়িয়ে এবং তার

পাশে সুপরিচিত কেদার দালাল, তার রোষ নিবৃত্তির জন্যে যথাসম্ভব ধীরে ধীরে কি বলছে।

রমেশবাবুকে এমন অসময়ে সেখানে আসতে দেখে কেদার চমকে সত্রস্তে বলে উঠল এঁ্যা বাবু আপনি এখানে?

রমেশবাবু টেবিলের উপর থেকে মদের বোতলটা তুলে নিয়ে বললেন, কি হচ্ছে কেদার, এত গোলমাল কিসের?

পাশে যে যুবতী দাঁড়িয়ে ছিল, সে বসল। সে বললে, দেখুন না বাবু, কেদার রোজ এই 'মাতালটাকে ধরে' নিয়ে আসে। আজ মা কালীঘাটে গেছেন তাই আমাকে একলা পেয়ে...

রমেশবাবু মাতালটার দিকে ফিরে বললেন, ও,—রমানাথ বুঝি? বেরো হারামজাদা বেরো। বলেই হাত তুলে সরোষে তার দিকে অগ্রসর হতেই সভয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে সে নীচে নেমে চলে গেল।

রমলা একটা হাঁপ ছেড়ে ধীরে ধীরে রমেশবাবুকে বললে—কেদারকেও একটু বলে দিয়ে যান।

কেদার পাশেই ছিল, বললে আমাকে কিছু বলতে হবে না রমলা যা বলবার আমিই বলে' যাচ্ছি বাবুকে।

রমেশবাবুকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে রমলা শুনতে না পায় এই ভাবে কেদার বললে রমলাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবেন বাবু?

কেদার আরও কি বলতে যাচ্ছিল, রমেশবাবু একটা ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে রমলার কাছে সরে এসে বললেন, কেদার, তুই যদি আর এ-বাড়ী মাড়াস্ তাহ'লে টেরটা পাবি বেশ ভাল করে, বুঝলি?

কখন কেমন করে কথা বলতে হয় কেদার তা বেশ ভালই জানত সে হাত জোড় করে কোমল সুরে বললে আজ্ঞে, আপনি যখন বলচেন তখন আর এ-পথে আসব?—রাম, রাম! বলেই দুইবার কানে হাত দিয়ে শপথ করলে। পরে সুরটা যথাসম্ভব নরম করেই কেদার হুইস্কির

বোতলটার পানে চেয়ে বললে, গোটা দুই সোডার বোতল দোকান থেকে নিয়ে আসব কি?—রমানাথ যখন ওটা ফেলেই গেল—

রমেশবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে সেখানেই থপ্ করে বসে পড়ে বললেন, যা নিয়ে আয়। পকেটে হাত দিয়ে একটা নোট বের করে বললেন পয়সা কড়ি তো সব ফুরিয়ে গেছে কেদার, এই একশ টাকার নোট আছে। একটু রেখে পুনরায় নোটখানা পকেটে রেখে বললেন, আচ্ছা, রামু পানওয়ালার কাছে আমার নাম করে বলগে যা, তাহ'লেই দেবে।

কেদার 'যে আজ্ঞে' বলে হাসতে হাসতে চলে গেল! রমলা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রমেশবাবুর কাণ্ডটা দেখছিল। রমেশবাবুই আগে কথা বললেন। বললেন, তুমি এখানে কতদিন আছো?

রমলা স্মিতমুখে বললে ছেলেবেলা থেকে। কামিনী বাঈজী আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।···দেখেছেন, মায়ের কেমন আক্কেল? কালীঘাটে গিয়ে এত রাত্রেও ফিরলো না—ভাবছি কোন বিপদ আপদ···

রমেশবাবু তাকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না—বললেন, আরে দূর্! কোন মদের আড্ডায় বসে গেছে হয়তো। ও সব পুরানো পাপী—বুঝলে?

রমলা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

রমেশবাবু একটু থেমে তার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা কথাটা কি সত্যি—কেদার যা বল্লে?

রমেশবাবুর বক্তব্যটা তেমন স্পষ্ট না হলেও রমলা বেশ বুঝতে পারল, তিনি কি প্রশ্ন করেছেন। তবুও বললে—কি সত্যি?

তুমি নাকি এখানে থাকতে চাও না?

রমলা এ কথায় যে কি উত্তর দেবে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না, পরে একটু ভেবে নীচের দিকে মুখ রেখে ধীরে ধীরে বললে—হ্যাঁ।

রমেশবাবু বললেন,—আমার সঙ্গে যাবে? আমার কেউ নাই একটা মেয়েমানুষ না থাকলে এতবড় বাড়ী চব্বিশঘণ্টা খাঁ খাঁ করে।

রমলা কি উত্তর দেবে ভাবতে লাগল। রমেশবাবু যে অসচ্চরিত্র এবং মাতাল, সে-কথা তাঁকে দেখেই সে টের পেয়েছিল। কিন্তু যারা ভালো তোদের দৃষ্টান্ত গতরাত্রে অনিমেশের ব্যবহারেই তো সে বেশ বুঝতে পেরেছে—আর কেনই বা তারা এ শয়তানীকে হোক, একটা আশ্রয় পেয়ে নারীর পূর্ণ অধিকার নিয়ে বসতে পারলে, অন্ততঃ এ পাপপুরীর অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাবে তো।

রমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রমেশবাবু আবার বললেন—চুপ করে' রইলে যে?

রমলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললে, হ্যা যাব। আপনার বাড়ীতে আর কে আছে?

রমেশবাবু একটু হেসে বললেন—থাকবার মধ্যে একটা উড়ে ঠাকুর, একটা চাকর, আর স্বয়ং আমি।...একটু থেমে আবার বললেন, আজই যাবে তো?—এই রাত্রেই?

রমলা একটু ইতস্তত করে বললে,—আজই? এ বাড়ীতে যে কেউ নেই।

একটা তাচ্ছিল্যের হাসিতে রমেশবাবু বললেন,—নেই বা থাকলো? ...তার পর, নিজের বুকের উপর হাত দিয়ে বললেন, এই রমেশ-বাবুর কথায় উঠে বসে, এমন লোক দর্জিপাড়ায় কত আছে জান? লোক রেখে যাব, ভয় কি? বাড়ী থেকে একটা দারোয়ান পাঠিয়ে দিলেই হবে।

এমন সময় কেদার সোডার বোতল নিয়ে উপস্থিত হল। রমেশবাবু বললে, পেয়েছিস্—বেশ বেশ, গেলাস কই রে?

কেদার তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা কাঁচের গ্লাস এনে দিতেই, রমেশবাবু আর ক্ষণবিলম্ব না করে অনেকটা মদ গলাধঃ

করণ করলেন। পরে একটু গম্ভীর হয়ে বসে বললেন, কেদার, তোকে আর একটি কাজ করতে হবে বাপু! শীগ্‌গির একটা ট্যাক্সি ডেকে দে। আর দ্যাখ, তুই এই বাড়ীতে আজ থাকবি, কাল কামিনী এলে বলিস্—রমলা আমার বাড়ীতে গেছে, আর এখানে ফিরবে না। তার জন্যে সে যা চায় তা দেবে।....

রমেশবাবুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কেদার বলে উঠল —আজ্ঞে—সে তো খুব ভালো, সে তো খুব ভালো। আমি এক্ষুনি গাড়ী ডেকে দিচ্ছি।—বলে, কেদার ট্যাক্সি ডাকবার জন্য পুনরায় নীচে চলে গেল।

....

রমলা সেই যে সে রাত্রে দর্জিপাড়া ছেড়ে রমেশবাবুর বাড়ীতে এলো আর তাকে সেখনে, ফিরে যেতে হয়নি। কমিনী মাঝে মাঝে রমেশবাবুর বাড়ীতে এসে রমলাকে দেখে যেত এবং মাসে মাসে নিজের ভরণপোষণর জন্যে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশটি করে টাকা নিয়ে যেত! আজ প্রায় দুই বৎসর হল, সে মারা গেছে, —কাজেই দর্জি-পাড়ার সঙ্গে রমলার এখন আর কোন সম্বন্ধ নেই। এখন সে রমেশবাবুর গৃহিণী—রমা।

ছয়

এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করেও রমার তৃপ্তি হতো না। সারা জীবন এমন নিরানন্দে বেঁচে থেকে লাভ কি? বাড়ীতে একটা ছেলে মেয়ে নেই, যাকে নিয়ে সে একমনে তার দিনগুলো কাটাতে পাবে। রমেশবাবু তো চব্বিশ ঘন্টা নিজের বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাইরের ঘরে সুরা পানে মত্ত থাকে। রমার দিনগুলো বই পড়ে পড়ে দাস দাসীর, সঙ্গে কথা বলে গৃহকর্ম্ম করে বড় যেন একঘেয়ে ও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই রমেশবাবুকে এক ভাইপো এখনও জীবিত আছেন শুনে, রমা তাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে অলককে নিজের কাছে এনে অনেকটা আশ্বস্ত হল। কিন্তু রমেশবাবুর মুখে সেদিন অলককে আবার ভিন্-গাঁয়ে ফিরে পাঠাবার কথা শুনে রমার অত্যন্ত রাগ হল। একে তো পুরুষ জাতটার উপর ছেলেবেলা থেকেই রমার বড় বেশী আস্থা ছিল না, তার উপর রমেশবাবুর এই কথাটা শুনে তার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। কি নিয়ে সে বেঁচে থাকবে? একটা পরের ছেলেকে বুকে ধরে সে যদি মাতৃত্বের সাধ মিটাতে চায়, তাতেও এই স্বার্থপর শয়তানের দল বাধা দেবার জন্যে হাঁ-হাঁ করে উঠে কেন? না—না কিছুতেই না, সে অলককে ছাড়বে না। যদি কোন মিনতি না শোনে, তা হলে তার নিরবলম্ব জীবন সে আর রাখতেও চায় না। আত্মহত্যা করে তার সব জ্বালা জুড়াবে তাও ভালো।

এমনি করেই দিন যায়। মাঝে মাঝে, একথা নিয়ে রমেশবাবুর

ও রমার ঝগড়া বাধে। কিছুক্ষণ দুজনেই কারও সঙ্গে কথা কয় না, পরে আরার কলহ মিটে যায়। কিন্তু দিন-দিন এমনি একটা অপ্রীতিকর আলোচনা রমার ভাল লাগছিল না। সেদিন মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে পড়ল। রমেশবাবুর সেজন্য রমাকে খানিকটা তিরস্কার করতেও ছাড়লেন না। দুরন্ত অভিমানে ক্রন্দনের তিক্ত বিষ তার কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠেছিল, কোন রকমে নিজেকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে রমা অন্যত্র চলে গেল। রমেশবাবু সেইখানে বসে ফোঁসফাঁস করে গর্জন করতে লাগলেন।

বিকেলে মোটরে বেড়াতে যাবার জন্যে রমেশবাবু বললেন,—রমা চল।

রমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল, আমি যাব না—তুবি যাও।

সান্ধ্য ভ্রমণ থেকে ফিরে রমেশবাবু ঘরে ঢুকতেই দেখলেন, অলক পড়তে বসেছে; রমা নেই। জিজ্ঞাসা করলেন তোর মা কোথা রে ?

অলক বললে,—পাশের ঘরে।

পাশের ঘরের চৌকাটে পা দিতেই রমেশবাবু দেখলেন, রমা ঘরের মেঝের উপর কতকগুলো কাপড়, জামা, শাড়ী ইতস্তত ছাড়িয়ে একটা বড় ট্রাঙ্ক নিজেই টেনে টেনে অতিকষ্টে কোণের দিকে সরিয়ে রাখছে।

রমেশবাবু বললেন,—এ সব আবার কি ?

রমা বললে,—আমি এখানে আর থাকতে চাই না।

রমেশবাবুর মনের নেশা তখনও কাটেনি। হাতের ছড়িটা ঘুরাতে ঘুরাতে বললেন,—যাবে কোন্ চুলোয় ?

রমা অতিকষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে বললে', আবার দর্জিপাড়াতেই ফিরে যার। তুমি অলককে ভিন গাঁ পাঠিয়ে দিও।

আজ কয়েকদিন থেকেই রমেশবাবু রমার উপর বেশ

একটু রেগেছিলেন, তার উপর আজ দর্জিপাড়া যাবার কথাটা শুনে রাগে জ্বলে উঠলেন। চোখ রাঙিয়ে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শয়তান তখন তাঁর কাঁধে চেপেছে, তাই কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত পশুর মতন হাতের ছড়ি দিয়ে সপাসপ ঘা কতক রমার পৃষ্ঠে বসিয়ে দিলেন। রমা স্তম্ভিত হয়ে ফিরে তাকালে, বেত্রাঘাতের যন্ত্রণায় দিকে তখন তার লক্ষ্য ছিল না। পাশের ঘর থেকে অলক যদি কাণ্ডটা দেখতে পায়, তা হলে সে যে কি মনে করবে এই ভাবনায় তাড়াতাড়ি রমেশবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে অনুনয় করে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি গো! অলক শুনতে পাবে যে! একি করছ তুমি?

রমেশবাবু উত্তরে কিছুই না বলে গম্ভীরভাবে সেখান থেকে চলে গেলেন।

সমস্তটা রাত্রি রমেশবাবু রমার সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন। তাঁকে কথা বলাবার জন্য রমা অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু না পেরে অবশেষে সেও জেদ ধরে বসল, রমেশবাবু সাধ্যসাধনা করলেও সে আর তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন না—তবে উপযুক্ত শাস্তি সে তাঁকে দেবে

রাত্রে কমলাকে স্বপ্নে দেখে অলকের মন কেমন করতে লাগল। সকালে উঠেই রমাকে বললে,—একটা পোষ্টকার্ড দাও জেঠিমা, মাকে চিঠি লিখব।

রমার মনটা মোটেই ভাল ছিল না। বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—সকাল বেলা চিঠি লিখতে হয় মা—তোর মা কি মরেছে?…যত জ্বালা আমার!

কথাটা শুনে অলকের মনটা আরও খারাপ হয় গেল। তার অভিমানে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে এল। তার মনে হল, আর এ বাড়ীতে থাকবে না, ভিন্‌গাঁয়ে পালিয়ে যাবে।

অলক ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলো, ফটক পার হয়ে রাস্তায় এসে

দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখল, কেউ কোথাও তাকে দেখছে কিনা। দেখল, ঝি, চাকর, দারোয়ান কেউই নেই, কেউই তাকে নিষেধ করছে না।

অলকের গায়ে ছিল একটা মলিন সার্ট, পরনে একটা খাকি রঙের হাফপ্যান্ট, পায়ে কিছুই না। আর একবার পেছন ফিরে দেখে, অলক রাস্তায় নেমে সোজা বাঁ দিকের রাস্তা ধরে দৌড়তে আরম্ভ করল। সকালবেলা ফুটপাথের ওপর বেশী লোক ছিল না, কাজেই নির্বিবাদে সে চলতে লাগল। সোজা দৌড়লে পাছে কেউ তার অনুসন্ধান করতে এসে ধরে ফেলে, এই ভেবে দু'-একটা মোড় ফিরে অবশেষে সার্কুলার রোডের ওপর এসে উপস্থিত হলো। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেসা না করে সে দৌড়ে যখন হাঁপিয়ে পড়ে, তখন খানিকটা আস্তে চলে, আবার দৌড়ে এমনি করে সে অনেকদূর এসে অবসন্নের মত রাস্তার পাশে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াতেই দেখল, পাশের একটা দোকানের ঘড়িতে বারোটা বেজেছে।

উঃ, অনেক বেলা হয়ে গেছে তো! রৌদ্রে দৌড়ে পিপাসায় তার তালু শুকিয়ে গেছিল। রাস্তায় একটা কলে খানিকটা জল খেয়ে যখন সে আবার চলতে আরম্ভ করল তখন তার পা আর চলে না। অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল এবং ক্ষুধাও পেয়েছিল, কিন্তু কি খাবে? সঙ্গে তো একটি পয়সাও নেই। তার মনে ছিল ভিনগাঁ সেখান থেকে আর বেশীদূর নয়—নিশ্চয়ই সে সন্ধ্যায় মায়ের কাছে পৌঁছবে। মা তাকে দেখে নিশ্চয় অবাক্ হয়ে যাবে। সে যখন জিজ্ঞ্যসা করবে, তুই কেমন করে এলি রে অলক? সে তখন কোন কথাই বলবে না, শুধু মায়ের গলা জড়িয়ে খুব হাসতে থাকবে। আচ্ছা, মামা যদি তার পালিয়ে আসার অপরাধের জন্য তিরস্কার করে? না মামার সঙ্গে প্রথমে কিছুতেই দেখা করা হবে না। রান্নাঘরের দেওয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে প্রথমে সে মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, মামা কোথায়,—তারপর খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকবে। এমনি-

সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে অলক আরও কিছুদূর অগ্রসর হল। রাস্তা দিয়ে একটা লোক পার হচ্ছিল, হঠাৎ কি ভেবে অলক তাকে প্রশ্ন করে বসল, হাঁ গা, ভিন্‌গাঁ, এখান থেকে কতদূর?

লোকটি থেমে বলল, সে আবার কোথা?

কেন, বর্দ্ধমান জেলা।

আমি জানি না বাপু!—বলে সে চলে গেল।

অলক মুখ বিকৃত করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাকে বললে, তুমি আমার কচু জান!

লোকটি অলকের কথা শুনে একটু হেসে আবার চলতে লাগল।

অলকের অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল, এই সময় কিছু খাবার পেলে সে খায়। ভাত পেলে তো খুব ভালই হয়। কিন্তু রাস্তায় তাকে কে ভাত খেতে দেবে? তার চেয়ে বাড়ীতে গিয়ে খাবে।

রাস্তার ধারে বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা ছোট বাগানের পাশে একটি পাঁচ সাত বছরের সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে বেড়ার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। থোকা-থোকা কালো কোঁকড়ানো চুলের গোছা মেয়েটির পিঠের উপর এসে পড়েছে, হাতকাটা একটা সাদা জামার উপর—আসমানী রঙের শাড়ীখানী সুন্দর গায়ে বেশ মানিয়েছিল। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে উঠে বললে,—এই! তোর নাম কি?

মেয়েটি কালো চোখ দু'টি তুলে বললে,—আমার নাম রাণী। অলক আরও একটু কাছে সরে এসে বললে, তোদের বাড়ীতে আমাকে চারটি ভাত খেতে দিবি?

রাণী একটু আশ্চর্যান্বিত হয়ে তার মুখের পানে খানিকক্ষণ চেয়ে বললে,—তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি চট করে মাকে জিজ্ঞেস করে আসি। অলক বলল, দৌড়ে যা, দেরী করিস না রাণী—আমার বড্ডো খিদে পেয়েছে।

রাণী তার জামা ধরে তাকে খানিকটা কাছে টেনে এনে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুমুখের গলির ভেতব একটা দোতালা বাড়ী দেখিয়ে

বললে,—উ-ই যে রেলিং এ আমার কাপড় শুকোচ্ছে ওই বাড়ীটা আমাদের। তুমি দাঁড়িয়ে থেকো—বলে রাণী ছুটতে ছুটতে গলির ভেতর চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললে,—এসো মা ডাকছে।

অলক তাহার পিছু পিছু বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আর কাপড় ধরে কোলের কাছে টেনে এনে কানে-কানে চুপি চুপি বললে —না আমি যাব না; তোদের বাড়ী অনেক লোক আছে—আমার লজ্জা করে।

দুৎ মা আর আমি। আর কেউ নেই। তুমি দেখবে এসো। —বলে রাণী তার হাত ধরে একপ্রকার টানতে টানতেই বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।

সাত

রাণীর মা অনীতা বিধবা হয়েছিল, রাণী যখন তিন বছরের। পিতৃকুলেব নিজের বলতে কেউই ছিল না। দূর সম্পর্কের ভাই. ভাইপো যারা ছিল, তারা তার স্বামীর মৃত্যুর পর কোন খোঁজ-খবর নেয়নি। সম্পত্তির মধ্যে তার স্বামী কলকাতা শহরে দুখানি বাড়ী রেখে গেছিলেন, নচেৎ মেয়েটাকে নিয়ে অনাথাকে পথে দাঁড়াতে হত। মাসিক দেড়শ টাকা ভাড়ার একখানি বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়েছিল আর একখানিতে তারা নিজেরা বাস করত। অনীতা মনে করেছিল, রাণী একটু বড় হলেই তার বিবাহ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে কাশীবাস করবে, কিন্তু রাণীব মুখের পানে তাকালেই তার সব যেন গোলমাল হয়ে যেত—কাশী বাসের চিন্তাটা, নাতি-নাত্‌নীর ঠান্‌দিদি হবার ইচ্ছার ভেতর কোথায় ডুবে যেত।

অনীতা দিবারাত্রি নানা চিন্তা করত। এক একবার ভাবত, একটা মেয়ের আর কতটুকু আশা? আজ আছে, কাল নাই! তার চেয়ে যদি আর একটা ছেলেও থাকত!…একটি ভাই একটি বোন! যাক আজন্ম দুঃখ-দুর্ভোগ সইবার জন্যে পোড়া কপাল নিয়ে যারা জন্মায়, তাদের এত সব ভাবলে চলে না।

এমন সময় একটা চমক-চঞ্চল বিদ্যুতের মতই পলাতক অলক এলো দু'টি অন্নের ভিক্ষারী হয়ে! এ আবার কোন মায়ের হারানিধি তুই?—ক্ষণিকের দেখা দিতে এসেছিস বাছা।

অলক চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়েছিল—খালি পা, হাফ-প্যান্ট-পরা, গায়ে একটা সাদা জামা, মাথায় একমাথা বড় বড় কোঁকড়া চুল।

অনীতা তাড়াতাড়ি মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললে, কোথা থেকে আসছ বাছা ?—তোমার নাম কি ?

অলক কথা বলতে পারছিল না, পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছিল, বললে,—আগে এক গ্লাস জল খাব।

অনীতা তাড়াতাড়ি একটা থালায় কতকগুলো মিষ্টি ও এক গ্লাস জল এনে বললে, এইগুলি খেয়ে নাও, আমি ভাত এনে দিচ্ছি।

অনীতা চলে গেল, অলক থালার সব কয়টা সন্দেশ খেয়ে বললে,—রাণী, তোর মাকে বলে দে, আমার পেট ভরে গেছে—আর ভাত খাব না।

রাণী বললে,—বাঃ, তুমি যে বল্লে খাবে।

অলক সমস্ত জলটা খেয়ে বললে, আমার কি দোষ ? পেট ভরে গেল যে ! আমি চল্লুম। বলে অলক উঠে বললে, তোর মাকে বলে দিস।

রাণী তাড়াতাড়ি অলকের হাতখানা ধরে বললে,—মা, শীগ্‌গীর এসো—না খেয়ে পলিয়ে যাচ্ছে।

অলক বললে, তুই আমার সঙ্গে জোরে পারবি ? টেনে ধরে আছিস যে বড় !....ছেড়ে দে, সন্ধ্যা হয়ে যাবে যে !

রান্নাঘরে তরি-তরকারি সবাই ছিল, ভাত প্রায় ছিল না বললেই হয়, অনীতা তাই তাড়াতাড়ি চারটি চারটি চাল চড়িয়ে দিয়ে ওপরে আসছিল। রাণীর কথাটা শুনে ঘরে ঢুকতেই দেখলে অলক চলে যাবার জন্য ব্যস্ত—রাণী কিছুতেই চাড়বে না। অনীতা বললে, কোথা যাবে বাবা এত রৌদ্রে ?

অলক অনীতার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, আমি আর ভাত খাব না, বাড়ী চল্‌লুম।

কোথা ?

ভিন্‌র্গা। অনেকদূর যেতে হবে। সেই বর্দ্ধমান জেলা।

কথাটা শুনে অনীতা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল,—ছেলেটা বুঝি পাগল। বললেন, এতদূর কেমন করে যাবে ? কোথা থেকে আসছ ?

আলক অনিতার একটু কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললে,—জেঠিমায়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। হেঁটেই যেতে পারব।

রাণী চুপ করে থাকতে পারলে না; বলে উঠল, হ্যাঁ, হেঁটে আর যেতে হয় না! আমি ভূগোলে পড়েছি,—বর্দ্ধমান অনেক দূর চিনতেই পারবে না।

অলক রাণীর দিকে ফিরে বললে,—বাঃ, আমি জানি না বুঝি ? গাঁয়ে ঢুকতেই মস্ত মাঠ,—ট্রেনের লাইনের ধারে ধারে চারটে অশ্বত্থ গাছ,—আর সন্ধ্যেবেলা আম-বাগানের পাশে খুব ধোঁয়া হয়।··· জানিস ?

তাদের কথা শুনে অনীতা মনে মনে হাসলো। অলকের হাত ধরে উস্কো-খুস্কো চুলগুলো সরাতে সরাতে বললেন,—না রে ক্ষ্যাপা ছেলে, তুই এইখানে আজকার দিনটা থাক—কাল পাঠিয়ে দেব।

অলক হাঁ করে অনীতার মুখের পানে তাকিয়ে বললে,—নিশ্চয় বল, মিছে কথা নয়।

না রে মিছে কথা নয়।....রাণী তোরা এইখানে গল্প কর—আমি দেখে আসি ভাত হ'ল কি না। বলে অনীতা আবার নীচে নেমে গেল।

একটা ঘরে রাণীর নানারকমের বই, পুতুল ইত্যাদি থাকত। রাণী অলককে সেই ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বইগুলো দেখাতে লাগল।

তক্তাপোশের ওপর বিছানা পাতা ছিল; হাত পা ছড়িয়ে অলক তার ওপর শুয়ে পড়ল। বললে,—পায়ে বড্ডো ব্যথা হয়েছে; আজ কত হেঁটেছি জানিস রাণী ? সে অনেক—অনেক দূর। তুই হলে কখ্‌খনো পারতিস্ না।

রাণী কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু পরে বললে,—আমি গান গাইতে জানি। তুমি জান ?

অলক বললে,—না।

রাণী আর অন্য কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বললে,—আচ্ছা, একটা কাহিনী বল না ? আমি পাঁচটা কাহিনী জানি।

অলকের কিছু ভাল লাগছিল না, বললে, তুৎ, সেই রাতের বেলা কাহিনী বলিস, আমি শুনব। দিনে কাহিনী শুনলে রাতকানা হয়, জানিস ?

পরে দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। রাণীর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললে, আমি আর ইস্কুলে যাই না—সেদিন শতদল আমায় মেরেছিল।

রাণী উত্তরের প্রত্যাশায় অলকের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে, সে এরই মধ্যে কোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অলক যখন জাগল তখন প্রায় সন্ধ্যা। রাণীর দিনগুলো নিঃসঙ্গ হলেও এর পূর্বে বেশ কেটে যাচ্ছিল। অধিকাংশ সময়েই পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে, রাণী মার খেয়ে বাড়ী ফিরত, সেইজন্য অনীতা তাকে আর কারও সাথে মিশতে দিত না। স্কুলে সেদিন মার খেয়ে এসেছিল বলে তার স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়েছিল। অনীতা ভেবেছিল, বাড়ীতেই একজন শিক্ষক রেখে রাণীকে লেখাপড়া শেখাবে। রাণী এমনি করে সঙ্গীহীন অবস্থায়, কোনদিন মায়ের সঙ্গে গল্প করে, কোনদিন বই পড়ে, ঘুমিয়ে, গান করে, দিন কাটাচ্ছিল। তাই আজ অলককে পেয়ে তার মনে বেশ আনন্দ হল। মনে হচ্ছিল, আর তার দিনগুলা একা-একা কাটবে না —কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছিল, বোধহয় সে চলে যাবে—বাড়ীতে তার মা আছে, আরও কত কী আছে।—অলক ঘুমিয়ে পড়লে, রাণীর সে ক্ষণিকের বিরহ সহ্য হচ্ছিল না। এক একবার ভাবছিল, তাকে জাগায়

তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়, কিন্তু অনীতা তাকে উঠাতে নিষেধ করায় সে একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল।

অনভ্যস্ত পথ-চলার ক্লান্তির পর খানিকটা ঘুমিয়ে অলক বেশ স্বস্তি বোধ করছিল। রাণী তাকে আর মুহূর্তমাত্র অবসর না দিয়ে টানতে টানতে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সার্কুলার রোডের ওপর গাছের ফাঁকে ফাঁকে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে—মোটর গাড়ীগুলো ভোঁ-ভোঁ করে বিকট শব্দে পার হয়ে যাচ্ছে—ফুটপাথের ওপর কত লোক যাওয়া আসা করছে সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাসটা গায়ে মুখে এসে লাগায় অলক নিমেষেই সব যেন ভুলে গেল। এমন নির্বিবাদে কলকাতার এই জন-কোলাহল সে তো কোনদিনই দেখতে পায় নাই! গলিতে রাণী একান্ত পরিচিতার মত তার হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

রাণী প্রথমে কথা বললে। বললে,—আমাদের ইস্কুল দেখাব, চল না রাস্তা ধরে আমরা দু'জনে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

অলক ধীরে ধীরে বললে,—মা বকবে না?

রাণী আগ্রহ সহকারে বললে,—না, মা কিচ্ছু বলবে না—আমি তো রোজ একা-একা যাই।

অলক রাণীকে টেনে একটু দূরে সয়ে এসে বললে,—আচ্ছা ওই মোটর গাড়ীগুলোকে তোর ভয় করে না?—আমি আর কাউকে ভয় করি না, শুধু ওই গাড়ীগুলো দেখলেই মনে হয়, এক্ষুনি চাপা দিয়ে দেবে।

তার কথা শুনে রাণী হো-হো করে হেসে উঠল। খানিক পরে হাসতে হাসতে তার হাতখানা চেপে ধরে রাণী বললে,—না মোটর চাপা পড়বে না, এসো তুমি।···এইখানে একটা খুব সুন্দর পার্ক আছে।

সে আবার কি রে?

দেখবে এসো—কেমন সুন্দর দোলনা আছে, কত মেয়েছেলে বেড়াতে যায়! এমন সুন্দর তুমি কখনও দেখ নি।

রমেশবাবুর বাড়ীতে অলক সত্যই কোন কিছু দেখবার সুযোগ পেতো না। চারিদিকে একটা বাঁধা-ধরা নিয়মের ভেতর তাকে যেন স্প্রীংএর গুঁতো খেয়ে ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করতে হত। কিন্তু সঙ্গী তার বেশ ভাল লাগছিল; বললে, চল তাই দেখে আসি।

রাণী তাকে টেনে নিয়ে ছোট ছোট গাছের বেড়া দেওয়া লেডিজ পার্কের ভেতর একটা মেহেদি গাছের তলায় ঘাসের উপর গিয়ে বসল। কতকগুলি স্কুলের ছোট বড় মেয়ে দোলনায় দুল ছিল—বড় বড় মেয়েরা দল বেঁধে এখানে-ওখানে কেউ বেঞ্চের উপর, কেউ মাটিতে বসে গল্প করছিল,--ছোটমেয়েরা ঘাগরা ঘুরিয়ে চুল দুলিয়ে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—রূপগুণ, ধনদৌলতের সমালোচনা গানের চর্চা, ঝগড়া ঝাটি, গল্প-গুজব একসঙ্গে সবই চলছিল। অলক একদৃষ্টে এইসব দেখছিল। রাণী বললে, ওই যে মাথায় লাল ফিতে বাঁধা মেয়েটা দেখছ—আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকে।···বড্ডো কুঁদুলে মেয়ে।

অলক মনে মনে কি ভাবছিল, হঠাৎ রাণীকে একটা নাড়া দিয়ে বললে, তুই স্কুলে যাস না কেন রাণী?

না, আমাকে ওরা মেরে খুন করে—আমি কিছু বলতে পারি না কি না তাই।

অলক রাণীর মুখের পানে চেয়ে বললে, তোকে মারে? আচ্ছা, তুই কাল থেকে স্কুলে যাস—দেখব, তোকে কে মারে। একবার দেখিয়ে দিস আমাকে, তারপর দেখে নেব কেমন মেয়ে সে।

রাণী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমরা দু'জনেই স্কুলে যাব তাহ'লে —তুমি আর কোথাও যাবে না বল!

অলক একটু ভেবে বললে, বাঃ, দুগ্‌গা পূজোর সবয় ভিনগাঁ না গেলে মা কাঁদ্‌বে। না,—তা হবে না।

রাণী একটু অভিমান করে বললে,—তোমার সঙ্গে কথা কইব না যাও !···দুর্গাপূজা তো সে-ই আশ্বিন মাসে।

বেশ, তাহ'লে সেই পূজোর সময় যাব।

চল, তাহ'লে মাকে বলি গিয়ে—চল্, ওঠ। বলিয়া রাণী তার হাত ধরে টেনে তুলে বললে, চল, আর এখানে থাকব না—মাকে বলি গিয়ে।

অলক যে তাদের বাড়ীতে অন্ততঃ পূজা পর্য্যন্তও থাকতে স্বীকৃত হয়েছে, এই আনন্দে রাণী একেবারে বিভোর হয়ে পড়ল। কি বলে যে সে তার কৃতজ্ঞতা জানাবে তা ঠিক করতে পারছিল না।

অলকের হাত ধরে লাফাতে লাফাতে যে চলল বাড়ির দিকে—মাকে এই শুভ সংবাদ জানাতে।

আট

একদিন চিঠি লেখবার জন্যে পোষ্টকার্ড চেয়ে অলক ধমক খেয়ে ফরে যাবার পরও রমা প্রায় আধঘণ্টাকাল তেমনি স্তব্ধ মৌনভাবে জানালার গরাদ ধরে বাইরের পানে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। ঝি এসে ডাকলে,—মা, তোমার চাকরের বিদ্যেটা দেখবে এসো—দুধের কড়াটা সবশুদ্ধ উনুনে উল্টে ফেলে ফ্যা ফ্যা করে হাসছে! মরণও হয় না ও-সব লোকের!

হঠাৎ চিন্তায় বাধা পেয়ে রমা ঝি-এর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, চল যাই।

ঝি চলে যাচ্ছিল, রমা ডাকলে ঝি, শোন—ঝি ফিরে দাঁড়ালে তাড়াতাড়ি ক্যাসবাক্সটা খুলে একটা টাকা বার করে হাতে দিয়ে রমা বললে, একটা চাকরকে পোষ্ট-অফিস থেকে একটাকার খাম পোষ্টকার্ড আনতে দাও তো। শীগ্‌গির,···বুঝলে?

ঝি টাকাটা নিয়ে চলে গেল, রমা কিন্তু সেখান থেকে এক পাও নড়ল না। সেই নির্জন ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে সুমুখেই ছোট বড় ছাতগুলোর পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মাইজী!···

হঠাৎ চকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে রমা দেখলে চাকর পোষ্ট অফিস থেকে খাম ও পোষ্টকার্ড নিয়ে এসেছে। সেগুলো তার হাত থেকে নিয়ে রমা বললে, অলক কোথা গেল দেখ্‌ তো বাবা! তাকে একবার ডেকে দে।

এই কড়াই দুধ উনানের ভেতর উল্টে ফেলায় চাকরটার বিলক্ষণ

সন্দেহ ছিল যে, হয়তো মা'জী তাকে বেশ একচোট শাসাবে এবং তার জন্য কি কি সাফাই দিতে হবে সে সমস্ত ঠিক করেই চাকরটি এসেছিল—কিন্তু যখন রমা সে সম্বন্ধে কোন কথাই বললে না, অধিকন্তু 'বাবা' বলে মিষ্ট সম্বোধন করে অলককে খুঁজে আনবার আদেশ দিল তখন তার আনন্দের সীমা রইল না। বৃদ্ধা ঝিকে মনে মনে গালাগালি দিতে দিতে সে অলককে ডেকে আনবার জন্যে নীচে নেমে এলো।

চাকর নীচের প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে অলকের সন্ধান পেল না; ভাবলে বাগানে আছে। সেখানেও যখন তাকে পাওয়া গেল না তখন উপরের ঘরগুলো খুঁজবার জন্যে সে পুনরায় উপরে উঠে গেল। উপরের কোন ঘরেই অলক নেই—তবে সে গেল কোথা! স্কুলে যাবার সময় হয়নি অথচ অলককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না—এ কি? চাকর একবার বাহিরের ফটকের কাছে এসে সুমুখের ফুটপাথের এদিক-ওদিক দেখলে, দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু কেউ তার সন্ধান বলতে পারলে না। অগত্যা সে বাড়ীর সমস্ত দাস-দাসীকে এ সংবাদ জানাতে বাধ্য হল। সকলে মিলে একটা হৈ চৈ গোলমাল বাধিয়ে প্রত্যেকটা ঘর তন্ন তন্ন করে সন্ধান করতে লাগল। রমা গোলমাল শুনে তাদের নিকট ছুটে এসে শুনল, অলককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি সর্ব্বনাশ। রমার মাথাটা ঝিম ঝিম করে ঘুরতে লাগল—চারিদিকে অলককে সন্ধান করবার তাড়া পড়ে গেল ক্রমে কথাটা বহির্বাটীতে রমেশবাবুর কানে পৌঁছল।

রমেশবাবু তাড়াতাড়ি উপরে এসে রমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে?

রমেশবাবু কোন রকমেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না; পরক্ষণেই যখন দেখলেন, ঝি চাকর সকলেই তার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন আর অবিশ্বাস করতেও পারলেন না। বললেন,

তার আর হয়েছে কি? এক্ষুণি ফিরে আসবে—সে ছেলে কোথাও যাবে না!

রমা বললে,—না গো না, সে তো কখনও বাড়ী থেকে একলা বেরোয় না, তার উপরে আজ আমি তাকে বেশ খানিকটা বকেছি!... একটু থেমে আবার বললে,—কেন বকতে গেলুম ছাই!...

বকেছ বেশ করেছ, সে কোথাও যাবে না, বলে রমেশবাবু রমাকে আশ্বাস দিয়ে নীচে নেমে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁরও মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাড়ীর প্রায় সমস্ত ঝি-চাকার তার সন্ধানে বের হয়ে গেছে—দুইজন দারোয়ান ফটকের কাছে হাঁ করে বসে ছিল। রমেশবাবু বললেন,·· ধরম সিং তুমি একবার হেঁটে হেঁটে ষ্টেশনে যাও— ছেলেটাকে যেখানে পাও ধরে নিয়ে এসো।

মোট কথা চারিদিকে লোক ছুটল। অলক যে-রাস্তা ধরে গেছিল, সেদিকেও দু'-একজন গেল, কিন্তু একে একে সকলেই ফিরে এসে হতাশ হয়ে পড়ল। ধরম সিং বেলা প্রায় একটার সময় হাওড়া ষ্টেশন থেকে এসে জানাল—তাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় রমা একেবারে দমে গেছিল; কিন্তু শেষ আশা ধরম সিং এর হাওড়া হতে প্রত্যাবর্তনের ভরসায় কোনরকমে চুপ করে বসে নানা কথা ভাবছিল। অবশেষে সে-ও যখন নিরাশ হয়ে ফিরে এল, তখন রমা আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। কলকাতার পথে ঘাটে নানারূপ দুর্ঘটনার সংবাদ তার অবিদিত ছিল না; হয়তো সে মনের অভিমানে কোথাও চলে যাবার জন্যে পথে বের হয়ে গাড়ী চাপা পড়েছে কিংবা কেউ তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে রমা মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন আজ এই অলকের সূত্র ধরে পুরানো দিনের অনেক বেদনা-দুর্ভোগের কথা তার মনে পড়তে লাগল। সে ভেবেছিল কারও দোষ নেই—তার মত ভাঙা কপাল নিয়ে যারা জগতে আসে তাদের আবার সুখ সম্ভোগের প্রত্যাশা

কেন ?....জন্মাবধি সে তো বেদনা আর ক্রন্দনকেই নিজের সাথীরূপে পেয়েছে, দুর্লভ হাসির সন্ধান সে তো কোনদিন কোনখানেই পায়নি —পাবেও না ! তার তপ্তবক্ষের জ্বালা জুড়াবার জন্যে সে যাকে বুকে টেনে নিতে চেয়েছে, সে-ই তো তার বুকের উপর নির্মম মত বিষাক্ত ছুরি হেনে চলে গেছে ! অবশেষে তার বুভুক্ষু মাতৃহিয়ার দুর্ণিবার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্যে যদি সে একটা পরের ছেলেকে কোলে পেয়েছিল, তাও আবার কোথায় চলে গেল। রমা ভাবত তার মত পাষাণ নারী হৃদয় বোধহয় সারা দুনিয়া খুঁজলেও মিলবে না, কিন্তু আজ তার সব চেয়ে বেশী ভাবনা হচ্ছিল যে, এ জীবনজোড়া প্রবঞ্চনার মূর্ত বেদনা নিয়ে আর সে বেশীদিন বাঁচবে না।

সমস্তদিন মাটিতে পড়ে রমা কাঁদতে লাগল। এত বড় আঘাত সে বোধ হয় জীবনে কোনদিনই পায়নি দাসদাসী এমন কি রমেশবাবু পর্যন্ত বহু সাধ্য সাধনা করেও তাকে এক গ্লাস জলও খাওয়াতে পারলেন না।

দ্বিতীয় দিন রমেশবাবু রামকে অনেক প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেও কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। রমার গায়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে আদর করে রমেশবাবু বললেন, ছি রমা ! এমন করে না খেয়ে কতকাল কাটাবে বল দেখি ? অলক যেখানেই যাক বেঁচে আছে— মরেনি তো ?

কথাটা শুনে রমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। তার রাগ হচ্ছিল রমেশবাবুর উপরেই সব চেয়ে বেশী।—সে বললে, দোহাই তোমার—তুমি আর বেশী কিছু বলো না বাপু ! তোমার জন্যেই এত কাণ্ড। রমেশবাবু বেশ মর্মান্তিকরূপে বুঝতে পারছিলেন যে, আজ শুধু তাঁরই জন্য এই অপ্রীতিকর অশুভ ঘটনাটা ঘটে গেল এবং সেই জন্যই রমাকে আর বিশেষ কিছু বলবার সাহসও তাঁর হচ্ছিল না। তিনি রমাকে খাওয়াবার জন্যে পুনরায় অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। হাতে ধরে বললেন, কিছু খাও লক্ষ্মীটি, আমি আজ পুলিসে খবর

দিয়েছি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি,—তোমার ছেলেকে এনে দেব....তার জন্যে আমিই দায়ী বুঝলে ?

রমা সেদিন আর রমেশবাবুর কথা কাটতে পারল না—এক বাটি দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন প্রাতে রমেশবাবু দেখলেন, রমার সমস্ত শরীর আগুনের মত গরম, সমস্তটা রাত্রি কেঁদে এবং জ্বরের তাড়নায় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। তিন-চারদিন ধরে অনাহার ও অনিদ্রায় তার মুখখানা একে তো আগে থেকেই শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছিল, তার উপর সমস্তটা রাত্রি জ্বর ভোগের পর তার চেহারাটা বহুকালের রোগীর মত এমনি বিকৃত দেখাচ্ছিল যে, রমেশবাবু আতঙ্কে চমকে উঠে বললেন, এ কি রমা। তোমার জ্বর হয়েছে ?

রমা জ্বরের ঘোরের একটি কথাও বলতে পারলে না, শুধু তার জ্বর-তপ্ত অবসাদগ্রস্ত হাতখানা সম্মুখে একবার প্রসারিত হল এবং পর মুহূর্তেই বিছানার উপর পড়ে গেল। অতিকষ্টে যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠে রমা অনুচ্চস্বরে বললে, আঃ মা গো—

নয়

পুরা আড়াইটি মাস জ্বরভোগ করে রমা সুস্থ হল একেবারে কঙ্কালসার অবস্থায়। শুধু তাই নয়, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তার একটা উপসর্গ এসে জুটল,—দিবারাত্রি আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা বলে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই উত্তর দেয়। সে অসংযত জটিল কথাগুলো কেউ বুঝতে পারে না। কাউকেও কোন কথা বলে না, কোন কাজ করতে আদেশ দিয়ে পরক্ষণেই সেটা ভুলে যায়। জ্বর সেরে যখন সে ঘুরে ফিরে বেড়াতে আরম্ভ করল তখন সে-সব উদ্ভট উপসর্গগুলো কিছুটা কমল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সারল না। জ্বরের সময় তার প্রকৃত অবস্থাটা ডাক্তারেও ভাল করে বুঝতে পারেনি—বিকারে প্রলাপ মনে করে সকলেই চুপ করে থাকত, কিন্তু এবার সকলেরই ধারণা হল যে, সে পাগল হয়ে গেছে। রমেশবাবু পুনরায় ডাক্তার দেখালেন, কিন্তু ডাক্তার সেই একই কথা বলে গেল—বহুদিন যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় দিবারাত্রি চিন্তার জন্য তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে, শীঘ্রই সেরে যাবে।

জ্বরের পর সে যখন-তখন হাসত, কাঁদত, গান করত এবং রমেশবাবুকে দেখলেই চটে লাল হয়ে উঠত, এমন কি কোন কোন দিন সম্মুখে ঝাঁটা ছড়ি, গ্লাস যা পেত তা নিয়েই তাঁর পিছু পিছু তাড়া করে মারতে ছুটত। ব্যাপার দেখে কোনদিন হয়ত তিনি ধমক দিয়ে শাসিয়ে দিতেন, কোন দিন বা হাসতে হাসতে ছুটে যেতেন। কিন্তু এইসব সংঘাতের মধ্যে সে অলককে ভুলে গেছিল কিনা জানি না, তবে

এইটাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অলকের কথা তার দিবারাত্রির সমস্ত চিন্তার ধন ছিল এবং যার জন্যে এত বিপর্যয়, সে তার নামটি পর্য্যন্ত ভুলেও কোনদিন মুখে আনত না বরং অলকের কথা তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে আসত! নির্বাক-বিস্ময়ে রমেশবাবু এই সব ব্যাপার দেখছিলেন।

সেদিন হঠাৎ রমা রমেশবাবুকে বলে বসল, আমাকে একটা টেবিলে-হারমোনিয়াম কিনে দাও,—গান শিখব।

রমেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—বুড়ো বয়সে আবার ও সখ কেন রমা?

এরই মধ্যে আমি বুড়ো হয়ে গেলুম বুঝি?—বলে রমা অস্বাভাবিকভাবে হো-হো করে হাসতে লাগল।

অগত্যা সেইদিনই রমেশবাবু একটা টেবিল হারমোনিয়াম কিনে আনলেন, গান শেখাবার জন্য দিনকতক পরে এক মহিলা শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত হল।

মাস দুই-তিন ধরে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে রমা গান শিখতে লাগল। শিক্ষয়িত্রীর নাম ছিল মালা—তারই সমবয়সী। কাজেই তার সঙ্গে বেশ একটু বন্ধুত্বও জমে গেছিল। হয়তো রমা সেই পূর্বের রমা থাকলে মালার সাথে তার সখীত্ব আরও ভালরূপেই জমত। এখন তার বন্ধুত্ব বা সখীত্বের অর্থ কেবলমাত্র কথা শুনবার একজন দোসর—কোনরকমে সময় কাটাবার সঙ্গিনী।

রমার কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন বিশৃঙ্খলতা, একটা উন্মনা খাম-খেয়ালি ভাব মালা প্রথমে লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু কথটা বলি-বলি করে আজ তিনমাসের মধ্যে সে তাকে সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করতে পারেনি। একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা যে রমার বুকের ভেতর গুমরে গুমরে দিবারাত্রি হাহাকার করছে, এ কথা মালা বুঝতে পারছিল, কিন্তু সে ব্যথা বেদনা যে কিসের এবং কোথায় তার সন্ধান সে শত চেষ্টা করেও কোনদিন তা বুঝতে পারেনি। রমা মালার সাথে প্রত্যহ নানারূপ

আলোচনা বা অবান্তর কথা বলত বটে, কিন্তু তার নিজের জীবনের ইতিহাস সে কোনদিন ভুলেও মুখ থেকে বের করত না।

সেদিন গান শেষ হলে, নিজের ইচ্ছাটা দমন করতে না পেরে মালা বলে ফেলল,—আচ্ছা ভাই, একটা সত্যি কথা বলবে ?

কি সত্যি কথা ?

তুমি দিনরাত মনমরা হয়ে থাক,—সব সময়েই কি-যেন ভাবছ মনে হয়। বল তো এ সব কি ?

কি এ-সব ? সে নিজেই বুঝে না— এ কি ? যে রহস্য তার কাছে চিরকাল দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেল, সে কেমন করে বুঝাবে সে বস্তু কি হয়তো এই অসুখের পূর্বে কেউ এ প্রশ্ন করলে সে তার একটা যা-হোক উত্তর দিতে পারত, কিন্তু এখন যে তার পক্ষে উত্তর দেওয়াও অসম্ভব। অনাহূত একটা বেদনা তার বুকে কখন থেকে যে চিরদিনের জন্য বাসা বেঁধেছে, সে খবর সে নিজেও ভাল করে জানত না। মনে হত, তার কি যেন নেই—কি ছিল আবার হারিয়েছে, হয়ত কখনও তা ফিরবে না। যা যায়—তা আসে না! আসে না! গতদিনের অনেক ছোটখাট কথ-কাহিনী সে ভুলে গেছিল, কিন্তু অলককে সে ভুলতে পারবে না যেন! না, না, সে তো বেশ ছিল,....কোন রকমে আনমনে দিনগুলো কাটছিল, কিন্তু না বুঝে ভুল করতে গিয়ে মালা তার মন্দই করল। আবার সেই বহুকালের পুরানো ইতিহাস,— আবার সেই পরের ছেলের সাধ-করে মা হওয়া—সব যেন তার চোখের সুমুখে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল!

রমাকে কোন কথা না বলে চুপ করে থাকতে দেখে মালা বললে, আমার কাছে বলতে লজ্জা কি ভাই, বল না!

আমি এমনি, জান চিরকাল এমনিই—বলে রমা সেখান থেকে উঠে এসে দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেন যে হঠাৎ উঠে এল নিজেই বুঝতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, মালার নিকট হতে সে ছুটে পালিয়ে যায়।—এ সব মেয়ে পরের বুকে আগুন জ্বেলে

দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে! দরজার নিকট হতে একবার পেছন ফিরে রমা বললে—তুমি আজ যাও মালা আজ আর গান শিখব না—আমার কাজ আছে। কথাটা বলেই, আর সেখানে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে রমা তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরে রমা পুনরায় সেই ঘরে ঢুকে দেখলে চেয়ারখানা শূন্য পড়ে আছে,...মালা চলে গেছে। তখন সে একটা মুক্তির নিশ্বাস ছেড়ে, জানালার কাছে চেয়ারখানা টেনে চুপ করে বসে পড়ল্। নির্জনে বসে তার মনে হতে লাগল,—কে যেন সজোরে তার গলাটা চেপে ধরেছিল, প্রাণপন চেষ্টায় এতক্ষণ পরে তার হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে সে দূরে সরে এসেছে। না—সে আজ থেকে গান শিখবে না—শিখবে না—শিখবে না! মনে মনে তিন সত্যি করে রমা ভাবল, সে নিজে না পারে, এ অপ্রিয় কথাটা দাসী-চাকরদের দিয়ে কাল মালাকে জানিয়ে দেবে যে, তাকে আর এ বাড়িতে আসতে হবে না ছাত্রীর শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে গেছে!

এমনি এলোমেলো নানা কথা ভাবতে ভাবতে অলকের মুখখামা তার মনে পড়ে গেল। আঃ! কি নিবিড় ভাবেই তাকে ভালবেসেছিলুম! কিন্তু আমার ভালবাসার মর্যাদা বুঝলে না! আর এক মায়ের কাছে ছুটে গেল। সে কি তাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসে—আমার চেয়েও! না—না এই দুরন্ত ছেলেগুলোই দুনিয়ার শয়তান। সে পাপ দূর হয়ে গেছে—ভালই হয়েছে। মরুকগে যাক্! সে অভিমানী শয়তানগুলো ভালবাসা চিনতে পারে না—আমাদের মত জন্ম-অপরাধী হতভাগিনীদের কলিজা কচ্‌লিয়ে বুকের বেদনা বাড়িয়ে দেবার জন্যেই ধুমকেতুর মত দেখা দিয়ে তারা চলে যায়।

অলকের বাক্সটার মধ্যে তার একখানা ফটো ছিল, বাক্সটা ঘরের এককোণে পড়ে থাকত। রমা ধীরে ধীরে সেখান হতে উঠে কি ভেবে এতদিন পরে অলকের বাক্সটা খুলে ফেলল। কয়েকখানা বইয়ের নীচ

হতে কাঁচে বাঁধান ফটোখানা বের করতেই নির্জীব ছবিতেও একবার অলকের মুখখানা দেখবার জন্য রমার বুকঘামা হা-হা করে উঠল, কিন্তু প্রাণপণে সে-ইচ্ছা দমন করে সে ছবিখানি মেঝের উপর পা নিয়ে থেৎলিয়ে ভেঙে চুরমার করে ধীরে ধীরে জানালা গলিয়ে বাইরে রাস্তার উপর ফেলে দিল। ফুটপাতের উপর কাঁচের টুকরাগুলো পড়বার ঝনঝন শব্দটা তার কানে যেতেই, রমা সেই নিস্তব্ধ নির্জন ঘরটার মধ্যে হো-হো করে বিকটশব্দে হেসে উঠল।

দশ

রমার মস্তিষ্কের বিকৃতি সারাবার জন্মে ডাক্তার তাকে প্রত্যহ বিকেলে ফাঁকা বাতাসে বেড়াতে বলেছিলেন। কাজেই প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে, মোটর গাড়ীতে চড়ে রমা ইডেন-গার্ডেন বেড়াতে যেত। রমেশবাবু সঙ্গে যেতে চাইলে, দু'-একদিন ছাড়া রমা তাঁকে সঙ্গে নিত না।

সেদিন রমা কোনরকমেই সান্ধ্যভ্রমণে যেতে চাইছিল না। রমেশবাবু অতিকষ্টে তাকে ঘর হতে বের করেলেন, কিন্তু তার সাথে যাবার প্রস্তাব করতেই রমা আপত্তি জানিয়ে বললে, তার চেয়ে তুমি মোটর নিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে এসো—আমি ভাড়া গাড়িতে যাই।

অন্য সময় হলে রমেশবাবু কোনরূপেই প্রস্তাব বরখাস্ত করতেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু রমার অসুখের পর হতে তিনি যেন রমাকে কতকটা ভয় করে চলতেন। এখনই মিছামিছি একটা কলহ বেধে যাবে, এই ভয়ে রমেশবাবু বললেন, আচ্ছা তাই যাও—বেশী রাত করো না যেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কি একটা মেলা বসেছিল। ল্যাণ্ডো গাড়ির ভেতর হতে উঁকি মেরে রমা দেখল বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে অদ্য মহিলাদের জন্য। গেটের পাশে টিকিট পাওয়া যাবে। রমা যদিও আজকাল লোকজনের ভিড় বড় একটা পছন্দ করত না, তবু আজ তার মেলাটা দেখে যাবার ইচ্ছা হল, সহিসকে বললে,—গাড়ীটা একবার রাখতে বল।

গাড়ী রাস্তার একপাশে নিয়ে দাঁড় করালে রমা গাড়ী হতে নেমে প্রবেশ পথের দিকে চলতে লাগল একটা দশ এগারো বছরের ভিক্ষুক বালক তার সুমুখে হাত পেতে কাকুতি মিনতি করে বললে,—খানা বেগর মর্ যাতা মায়ি, একঠো পয়সা—রমা সেদিকে কর্ণপাত না করে আপন মনে মেলায় প্রবেশ করবার দরজার নিকট এসে দাঁড়াল। ভিক্ষুকটা তখনও তার অনুসরণ করছিল, আবার বললে,—মায়ি, হাম আজ তিন রোজসে ভুখা হ্যায়।

রমা মুখ ফিরিয়ে দেখলে একটা বালক শতচ্ছিন্ন একখানা ময়লা কাপড় পরে লাঠিতে ভর দিয়ে তার নিকট কিছু ভিক্ষা চাইছে। ছেলেটাকে দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল—এরাই সেই নিমকহারামের জাত! আজ অভাবের তাড়নায় অনুগ্রহ ভিক্ষা করছে আবার অনুগ্রহ পেলে হয়তো উপেক্ষা করে চলে যাবে। তাকে রমার কিছুমাত্র দয়া হলো না। বাঁ হাত দিয়ে সজোরে তার চুলের মুঠিটা ধরে ফট করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে সরোষে বলে উঠল, শয়তান, বেরো? তারপর গাড়ীতে উঠে কোচমানকে বললে—চালাও, ইডেন গার্ডেন। ফুটপাথ হতে যারা এ ঘটনাটা দেখল তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাঁ করে গাড়ীটার পানে তাকিয়ে রইল, কেউ বা হৃদয়হীনা রমণীর একটা ভিক্ষুকের প্রতি এইরূপ নির্মম আচরণে ব্যথিত হয়ে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগল। আবার কেউ কেউ বা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে,—দাও না মহিল টিকে টেরটা পাইয়ে। রমা কিন্তু এ-সবে ভ্রূক্ষেপও করল না—গাড়ী হাঁকাবার আদেশ দিয়ে গম্ভীরভাবে চুপ করে বসে কি ভাবতে লাগল। দেখতে দেখতে রমার গাড়ীখানা মোড় পার হয়ে ধর্মতলার গাড়ীঘোড়া মোটর ট্রামের ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রমার আদেশে গাড়ীটা ঘুরে চাঁদপাল ঘাটের দিকের একটা দরজার পাশে দাঁড়াল। গাড়ী হতে নেমে ধীরে ধীরে গেট পার হয়ে রমা সোজা চলতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পূর্বে সে মেলা দেখতে গিয়ে

নিজের হাতে যে কাজটা করে এল, তা যে তার দ্বারা কেমন করে সম্ভব, শুধু এই কথাটা নিয়ে তার মনের মধ্যে গভীর আলোচনা চলছিল। অলকের এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত সে মুছে ফেলতে চায়, তবু কেন সে তা পারছে না? না অলকের বয়সী ছেলেগুলো পথে ঘাটে দেখা দিয়েই তো তাকে আবার সেই পূর্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুনিয়ার সমস্ত ছেলেই আজ তার চোখের বিষ হয়ে উঠেছে,—সে তো তাদের অনুগ্রহ করতে চায় না, অধিকন্তু পুরোমাত্রায় ঘৃণা করে। লোকে তাকে পাষাণী বলে, পিশাচী বলে ···বলুন—কোন ক্ষতি নাই। আজ ওই ভিক্ষুক ছেলেটাকে মাত্র একটা চড় দিয়ে তো তার মোটেই তৃপ্তি হয়নি—বরং সে যদি তাকে দুনিয়ার অবোধ মাতৃজাতির সমক্ষে খুন করে ফেলতে পারত তা হলেও কতকটা স্বস্তি অনুভব করতে পারত বোধ হয়··তারা নিমকহারাম—তারা নিষ্ঠুর।

প্যাগোডা পার হয়ে কৃত্রিম হ্রদের ধারে ধারে রমা অনেকটা পথ চলে এসেছিল। সে এমনি অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল যে, দু'-একজন দৃষ্টিশক্তিহীন পুরুষ তার গা ঘেঁষে চলে গেল—সেদিকে তার লক্ষ্যই ছিল না।

এতক্ষণ পরে সে একবার ভাল করে চোখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখল অদূরে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে এক ইংরেজ যুবতী স্বামীর সহিত হাত ধরাধরি করে ব্রিজ পার হচ্ছিল। তাদের হাসি ও কথা, ছেলেদের কলরব তার কানে এসে বাজল। একটু লক্ষ্য করে যুবতীর পানে তাকাতেই রমা দেখলে, সে মুখে কোথাও এতটুকু দুঃখের ছায়া পড়েনি—তার আনন্দোজ্জ্বল স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি একবার ছেলেদের পানে, একবার একবার স্বামীর মুখের পানে ফিরছে! রমার হিংসা হতে লাগল,—এই বিদেশিনী তো তার পূর্ণ অধিকার জগতের নিকট আদায় করেছে—পৃথিবীও তো তাকে সে অধিকারটুকু কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে

দিতে এতটু কর্পণ্য করেনি, আর তারই পাশে এ হতভাগিনী এমন কি অপরাধ করেছে, যার জন্যে সে শুধু প্রতারণা আর ব্যর্থতা নিয়ে প্রতি পদবিক্ষেপে বেদনা-দুর্ভোগ সৃষ্টি করে মরছে!

কিছুক্ষণ পরে তাদের মুখগুলো দূরে একটা সবুজ ঘন গাছের সারির মধ্যে মিলিয়ে গেল। রমার খানিকটা চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু চোখ দিয়ে একফোঁটা অশ্রুর চিহ্নমাত্রও দেখা দিল না। পথ চলতে চলতে লোকের পাশে একটা লতাকুঞ্জের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। এক ফিরিঙ্গি তরুণ-তরুণী একটা অনতিদীর্ঘ বেঞ্চের উপর বসেছিল। লতা-বিতানে ফুল ও সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে রক্তিম সূর্য্যের শেষ-বিদায়ের করুণ রশ্মিটুকু তাদের দু'টি সুন্দর মুখের উপর এসে পড়েছে। মনে হল, দুইটি আনন্দ-মূর্তি পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য—সমস্ত আলো একসঙ্গে উপভোগ করতে চায়। রমা কোন প্রকারেই তার পিপাসিত চোখ দুটো সেদিক হতে ফিরিয়ে নিতে পারছিল না। চুরি করে দেখার অপরাধ তাকে লজ্জা দিচ্ছিল বটে, কিন্তু এসব ছোট-খাট অন্যায় অপরাধকে সে আজকাল বড় বেশী গ্রাহ্য করত না। মনটাকে সে যা-খুশি করবার জন্যে একেবারে স্বাধান করে ছেড়ে দিয়েছিল বললেই হয়।

সুমুখে লেকের চকচকে কালো জলের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে তরুণ যুবক কি একটা কথা বলতেই তরুণী হেসে তার গায়ে ঢলে পড়ল, যুবক ধীরে ধীরে তার মুখখানি নামিয়ে তরুণীর সরম-রাঙা মুখখানি তুলে ধরল।

রমার প্রতি লোমকূপ হতে শিরা উপশিরাগুলো পর্যন্ত সিরসির করে উঠল। জোর করে সেদিন হতে নিজের দৃষ্টিটাকে সরিয়ে নিয়ে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে পুনরায় চলতে আরম্ভ করল।

লম্বা লম্বা শিরীষ ও দেবদারু গাছের নীচে কয়েকজন অফিসের বাবু, তাদের নিজের নিজের জুতাগুলো প্রত্যেকের পাশে খুলে রেখে ছুটির পর উবু হয়ে বসে গল্প-গুজব করছিল। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে

আসছে দেখে রমা বাড়ী ফিরবার মতলবে পেছন ফিরেই দেখল এক ছিপছিপে ভদ্রলোক হাতের ছড়িখানা ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ তার সুমুখে থেমে পড়ল। শুধু থেমে পড়লেও না হয় রক্ষা ছিল, রমা সেখান হতে ধীরে ধীরে চলে আসতে পারত, কিন্তু ভদ্রলোক যখন চোখ দুটো যথাসম্ভব বিস্তৃত করে তার দিকে আরও একটু সরে এসে কি একটা কথা বলতে উদ্যত হল, তখন আর রমা অভদ্রতা করে কথাটা না শুনেই চলে যেতে পারল না। ভদ্রলোকের গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে একখানা কোঁচান কালোপাড় দেশী ধুতি এবং পায়ে কালোরঙের পাম্প্‌স্ অর্থাৎ-আধুনিক ভদ্রলোক সাজতে যা কিছু প্রয়োজন তার সবগুলিই সে শ্রীঅঙ্গে শোভা পাচ্ছিল। ভদ্রলোক রমার মুখের পানে তাকিয়ে একেবারে হতাশ ভাবে বলে উঠল,—এই যা! আপনাকে বিনীতা ভেবে আমি জাহাজ ঘাটা থেকে ছুটে আসছি, কিছু মনে করবেন না আপনি।···যাক্, অপরিচিত হলেও গুড্ ইভি্নিং!

এই অপরিচিত নির্লজ্জ লোকটার ব্যবহার দেখে রমার রাগ হচ্ছিল আবার হাসিও পাচ্ছিল, ঈষৎ হেসে বলল, আমি আপনার বিনীতাকে চিনি না—একা—একা একটুখানি বেড়াতে এসেছি।

রমার কথাটা শুনে এমনি হাত-পা নেড়ে ভাবভঙ্গি করে কথা বলতে লাগল, যেন সে কতকালের পরিচিত। বলল, তা বেশ, বেশ! বিনীতার আসবার কথা আছে, সে এক্ষুনি আসবে। যাক্,—আসুন না একটু ওই বেঞ্চে বসে দু'টো কথা কই ততক্ষণ! আপনি কি ব্রহ্ম? আমরা ব্রহ্ম নই, ক্রিশ্চান—দ্যাট ইজ রিফরমড্।

রমা বললে, আমরা রিফর্মড্‌ও নই ব্রাহ্মও নই—আমরা হিন্দু! বলেই একটু হাসল। এরূপ স্বাধীনভাবে কোন পুরুষের সঙ্গেই রমা কোনদিন মিশে নি, মেশবার ইচ্ছাও হত না। আজ কিন্তু এই নব্য ছোক্‌রা-বাবুটিকে একটু খেলাবার ইচ্ছা তার মনে প্রবল ভাবে জেগে উঠল। কেন হল, তার কারণ সে নিজেই বুঝতে পারলে না। এই

সব ছোট খাটো খামখেয়ালীর অন্যায় অবিচারগুলোকে আজ সে একেবারে আমল দিতেই চাইল না এবং তার হঠাৎ মনে হল, যদি তার কোন খামখেয়াল তার সুদৃঢ় মনটাকে বিচলিত করেই ফেলে তাতেও ক্ষতি নেই।

উভয়ে বেঞ্চের উপর গিয়ে বসল, রমা যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলে,—বিনীতা আপনার কে ? ···

একটু থত মত খেয়ে যুবকটি বললে, সে আমার এক বোনের বন্ধু—বেথুনে আই, এ পড়তো—আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা। বুঝলেন কিনা···

এইবার রমা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে,—ও.... আপনার নাম ?

অমল বোস।

বাঃ, একেবারে আধুনিক—বেশ নাম। আপনি কি কলেজে পড়েন ?

রমার নামটি কি, তা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, অমল বোস সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করতে পারল না। বললে, আজ্ঞে না, আমি ষ্টুডেণ্ট নই—তবে বুঝলেন কিনা।

তার বুঝলেন কিনা'র অর্থ জানবার জন্যে রমার মোটেই আগ্রহ ছিল না, সে জানতে চাইলো, বিনীতার কথা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি বিনীতার বয়স কত ?

বয়স ?···একটু ভেবে উপর দিকে তাকিয়ে বললে আপনার চেয়ে ছোট, ধরুন—ঊনিশ কুড়ি।

রমা একটু হেসে বললে—অথচ আপনি তার সঙ্গে এমনি স্বচ্ছন্দে একা একা ঘুরে বেড়ান ?

নিমেষেই রেগে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে সে বললে—বাঃ তাতে দোষ কি ? আমার ক্যারেক্টার সম্বন্ধে দোষ দেয় এমন লোক আমি

স্পর্দ্ধা করে বলতে পারি, আমাদের ইউনিয়ানে···কথাট অর্দ্ধ-সমাপ্ত রেখেই পুনরায় বললে, মেয়েমানুষ জাতিটাকে আমি কখ্খনো বিশ্বাস করি না। আমি জানি, বিনীতার....ইয়ে···তেমন সুবিধের নয়, সেই জন্যই আজ তাকে গার্ডেনে ডেকে নিয়ে এসেছি, তার সাথে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার। আমি তার সঙ্গে আর মিশতে চাই না—কোনদিন বিপদে ফেলতে পারে।

সম্মুখে একটা কাঁকরের রাস্তার বাঁকে ঝোপের অন্তরাল হতে আধুনিক ধরণে সজ্জিত এক নব্যতরুণী তাদেরই দিকে অগ্রসর হচ্ছিল হঠাৎ ভদ্রলোকটির নজর তার উপর পড়তেই অতিশয় ব্যস্ততার সঙ্গে ছড়িটা হাতে নিয়ে বলে উঠল,—হ্যালো! হিয়ার ইজ—বিনীতা মিটার তাহলে আজকার মত গুডনাইট···আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে। বলে সে হাসতে হাসতে বিনীতার দিকে অগ্রসর হল। পাছে বিনীতা রমার কাছে এসে পড়ে এবং দুইজনে আলাপ পরিচয় জুড়ে দেয়, এই ভয়ে লোকটা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিনীতার হাত ধরে তাকে টেনে অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্ট করলেও, রমা তার চোখ এড়াল না এবং কিছুক্ষণ পূর্বে তাদের উভয়ের মধ্যে আলোচনা যে কি হচ্ছিল তাও সে টের পেয়েছিল।

অমল বোসের হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে বিনীতা বললে, আমার নামে যার-তার কাছে দোষ দিয়ে বেড়াও, সত্যিই কি দোষটা শুধু আমার? দাঁড়াও, ওঁকে সব বলে দিয়ে আসছি।

অমলবাবু যে এরূপ ভাবে অপদস্থ হবে তা জানত না, কাজেই বিনীতাকে সেখান হতে ফেরবার জন্যে অনুরোধ করতে, না পারল নিজে অন্যত্র চলে যেতে।

মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় জমতে সময় খুব কমই লাগে। বিশেষতঃ এরূপ ক্ষেত্রে রমার সঙ্গে পরিচয় করতে বিনীতাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হল না। বিনীতার নিকট হতে অমল বোসের যে পরিচয়

রমা পেল, তাতে সে স্তম্ভিত না হয়ে থাকতে পারল না। একে তো পুরুষ জাতটাকে সে বিশ্বাস করত না তার উপর একটা রমণীর সর্বনাশ করে অবশেষে তাকেই পথে বসাবার ইচ্ছা অমল বোসের মত শিক্ষিত যুবকের কতদূর অন্যায় ও গর্হিত তা সে বেশ বুঝতে পারল।

বিনীতা বললে এখনও উপায় আছে দিদি,—এখন যদি সে···

রমা রাগে গসগস করছিল, বললে,—পরের ঝক্কিঝঞ্ঝাট সইবার মত মনের অবস্থা আমার নয় বোন। আমি নিজের জ্বালাতেই মরছি বলে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বেঞ্চ হতে উঠে রমা বললে,—আমি চল্লুম ভাই, রাত হয়ে যাচ্ছে।

বিনীতাও সঙ্গে সঙ্গে উঠল। অমল বোস অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল—সেও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

গেটের পাশে রমার গাড়ী তখনও অপেক্ষা করছিল। রমা গাড়ীতে উঠবার আগে বিনীতাকে বললে, ও শয়তানকে হাতছাড়া করো না বিনীতা। তুমি কোন দোষ না করলেও সমাজ তোমার কথা শুনবে না তো!

রমার কথাটা অমলবাবু শুনতে পেয়েছিল, তাই একটু কাছে সরে এসে বললে, ও সব কান্-ভাঙানি পরামর্শ দেবেন না অপনি। হাজার বললেও আমি কোন অসচ্চরিত্রা মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না!

বিনীতা এ কথাটার উত্তরে চোখ রাঙিয়ে একটা কড়া রকমের জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু রমা তাকে বাধা দিয়ে বললে, একটু ভেবে চিন্তে কথা বলবেন অমলবাবু, আমি আপনার মত শয়তান, জোচ্চোরে ঢের দেখেছি—দর্জিপাড়া, রামবাগান আর সোনাগাছির দোরে-দোরে তারা ঘুরে বেড়ায়। এ রকম করে পাপের বোঝা বাড়ানোর চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়াও ভাল। আর বেশী কিছু না বলে রমা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়তেই কোচমান আদেশের অপেক্ষা করে গাড়ী হাঁকিয়ে দিল। অমল বোস কটমট করে একবার বিনীতার দিকে নিষ্ফল বিক্ষোভে তাকাতে লাগল।

এগারো

এদিকে দেখতে দেখতে পূজার দিন নিকটবর্তী হতে লাগল। অলকের আসবার কোন কথা নেই, এমন কি একখানা চিঠি পর্যন্ত আসে না। কমলা ভেবে অস্থির। মাঝে মাঝে এক একদিন অমরেশের কাছে বলে, আবার নিজের মনেই ভাবে আর কাঁদে! অমরেশ অলকের খবর পাবার জন্যে রমেশবাবুকে তিন-চারখানা চিঠি দিয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত একখানা চিঠিরও উত্তর না পেয়ে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। পূজার ষষ্টির দিন সে নিজে কলকাতা গিয়ে অলককে একবার নিয়ে আসবে মনে করেছিল, তাও কমলা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সে ধিকাংশ সময়েই বলত,—একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব পূজার সময়। তুমি ভেবো না।

অবশেষে কমলার অনুরোধে পঞ্চমীর দিন অমরেশ কলকাতা রওনা হল। রমেশবাবুর বাড়ী সে কোনদিন চোখে দেখেনি, তাই তাঁর সুবৃহৎ অট্টালিকা এবং সদর দরজার উপর দারোয়ান ইত্যাদি দেখে প্রথমে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সলাজচ্যুত ও দেশত্যাগী রমেশবাবু এরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কলকাতা শহরে বাস করতে পারেন। যা হোক, তার আনন্দও হচ্ছিল যে, একান্ত নিঃসহায় অলক আজ কতসুখে আছে! সুখে আছে স্বীকার করি, কিন্তু এই সুখৈশ্বর্যের মধ্যে বাস করে সে বোধহয় তার গরীব মামার ভিনগাঁয়ের কুঁড়ে ঘরটির কথা ভুলে গেছে, হয়তো কমলাকে আর তার মামাকে মনে

নেই। তা না থাকুক্, অলক যদি সুখে থাকে আর মাঝে একবার কবেও তাদের দেখা দেয়, তা হলেও তো তারা বাঁচা!

বাইরের একটা ঘরে রমেশবাবু তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসর গুলজার করে বসেছিলেন। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে অমরেশ ভেতরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছে দেখে রমেশবাবুর মুখখানি এতটুকু হয়ে গেল, তবু কেউ জানতে না পারে এইভাবে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন —আরে আরে আসুন অমরেশবাবু! ভেতরে আসুন!

অমরেশ হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকল। রমেশবাবু যথারীতি অভ্যর্থনা করে তাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। সেদিনের মজলিস প্রায় ভাঙো ভাঙো হয়েছিল, কাজেই একে একে অন্যান্য সকলেই উঠে পড়লেন। সকলে চলে গেলে অমরেশ জিজ্ঞাসা করলে; চিঠির উত্তর না পেয়ে আমরা ভেবে সারা হচ্ছি, যাক বাড়ীর সব ভালো তো? অলক ভাল আছে?

রমেশবাবু এই আকস্মিক প্রশ্নে চমকে উঠে কি উত্তর দেবে ঠাহর করতে না পেরে বললেন—ভেতরে চলুন—শুনবেন সব। আরে ভাই, যে বিপদে পড়েচি! বলেই আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে রমেশবাবু অমরেশকে একপ্রকার টানতে টানতে সিঁড়ি ধরে উপরে নিয়ে গেলেন। তার ইচ্ছা, অমরেশকে যেন কোনপ্রকারে রমার কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

রমার ঘরের বাইরে দরজার একপাশে একটা চেয়ার পড়েছিল, তাতে অমরেশকে বসতে বলে রমেশবাবু রমার ঘরে ঢুকে বললেন, ওগো অমরেশ এসেছে—অলকের মামা! জল টল খেতে দাও, বুঝলে? এই পর্যন্ত বলেই গুঁই গুঁই করে এমনিভাবে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন যেন তাঁর কত না অসমাপ্ত কাজ পড়ে আছে। অমরেশ কিছুই বুঝতে পারল না—চুপ করে কলের পুতুলটির মতন বাইরের চেয়ারখানার উপরে বসে রইল।

অলক সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে, এই

ভাবনায় রমা একটু বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে মনের কৌতূহল দমন করতে না পেরে দরজার পর্দাটা একটু সরিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে দেখে নিলে লোকটি কেমন এবং কে। পর্দার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তাতে রমা অমরেশকে বেশ ভাল করে দেখতে পেল, অমরেশ কিন্তু কিছুই দেখল না।···এ্যাঁ, এ কি! রমা আশ্চর্যান্বিত হয়ে খানিকটা পিছিয়ে এল। বহুকাল পূর্বের একটা কথা তার মনে পড়ল—দর্জিপাড়ার সেই পিশাচ-পুরী হতে মুক্তিলাভের জন্মে প্রথম যে দিন জানালা খুলে মেসের এক ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছিল তারই প্রতিমূর্তি রমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠল। এই তো সেই অমরেশ রায়! পৈশাচিক প্রতিহিংসার একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ রমার শিরায় ছুটতে লাগল। হাত-পা থর থর করে কাঁপতে লাগল, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। খানিক পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে পর্দার আড়াল হতেই রমা বলল—আপনি কি জন্যে এসেছেন, অমরেশবাবু?

পর্দার অন্তরাল হতে নারী এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে অমরেশ একটু বিস্মিত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, অলকের কোন খবর পাইনি—তার মামী-মা বড় ভাবছে, তাই তাকে একবার নিয়ে যাবার জন্মে এসেছি।

অলকের নামে রমার আপাদ-মস্তক আবার জ্বলে উঠল: বললে—আমি যদি তাকে না পাঠাই—তা হ'লে?

ধীরে ধীরে অমরেশ বললে, না পাঠান, তাতে তো আর জোর নেই, তবে কিনা....

রমা আর একটু জোর গলায় বললে, মামা হ'য়ে ভাগ্নের উপর এত দরদ কেন বলুন দেখি? ছেলেপুলে নেই বলেই তো? আপনার স্ত্রীর যদি একটা ছেলে কি মেয়ে থাকতো, তাহ'লে হয়তো ভাগ্নেকে লাথি মেরে দূর করে দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। বলুন সত্যি কি না?

আমতা-আমতা করে অমরেশ বললে, তাই কি হয়, তাই কি হয়?

হয় না বলতে চান ? বাংলার ঘরে ঘরে আপনার চোখের সামনে কত গণ্ডা দেখতে পাবেন। বোন হয়তো ছেলেপুলে নিয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর তারই ভাই হয়তো সুখে-স্বচ্ছন্দে মদ খেতে বিষয়টাকে উড়িয়ে দিচ্ছে। বাপ নিজে হয়তো একটা পথের ভিখারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে নিঃসহায়া ভিখারিণী করে দিলেন, আর ছেলে হয়তো বাপের বিষয়সম্পত্তি রাজার হালে ভোগ করতে লাগলো, বোনের কষ্ট একবার মুখ ফিরিয়েও দেখলে না! তাই বলছিলুম অমরেশবাবু, আপনার অলকের উপর এত দয়ামায়া শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। যাক—জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হোন, তারপর যা হয় হবে।

রমা ঘরের ভেতরের একটা দরজা দিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে দেখলে, ঝি জলখাবারের থালা সাজিয়ে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। রমাকে দেখেই ঝি জলের গ্লাসটা অমরেশের কাছে নিয়ে গেল। রমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তার ঘরের একটা দেওয়ালে টাঙানো বড় আর্শিটার সুমুখে চেয়ারখানা টেনে থপ্ করে বসে পড়ল।

অমরেশের জল খাওয়া শেষ হবারমাত্র রমা পুনরায় তার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। এইবার কি বলে কথাটা আরম্ভ করবে তাই ভাবছে, এমন সময় অমরেশ যবনিকার অন্তরালবর্তিনী রমার উদ্দেশে বলে উঠল, অলককে আমার সঙ্গে একবার পাঠিয়ে দিন, আজই আমি তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে চাই।

এইবার রমারই মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হচ্ছিল না; অতিকষ্টে ঠোঁট চেপে নিজেকে দৃঢ় করে বললে, আপনাকে এতদিন জানতে দিইনি অমরেশবাবু, আজ প্রায় তিন-চার মাস হ'ল অলক আমার উপর রাগ করে কোথা পালিয়েছে, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

শেষের কথা কয়েকটা রমার ক্রন্দন-কাতর সিক্ত-কণ্ঠের ভেতর হতে এমনভাবে ভিজে ভিজে বার হল যে, নিজের দুর্বলতা রমা নিজেই বেশ বুঝতে পারল। অমরেশ কিন্তু এ কথাটা ভাল করে বিশ্বাস করতে পারলে না। সে গুম্ হয়ে বসে রইল। রমা আবার বললে, আমার

নিজের লোক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ভিনগাঁয়েও সন্ধান নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনার কাছেও সে যায় নি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, এমন কি—বলে রমা তাড়াতাড়ি একটা দেরাজের ভেতর হতে একখানা খবরের কাগজ বের করে পর্দার ফাঁক দিয়ে কাগজটা অমরেশের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে, খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু—

কাগজের বিজ্ঞাপনে অলকের ফটো, পুরস্কার ঘোষণা এবং রমেশ বাবুর নাম ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখে অমরেশ আর অবিশ্বাস করতে পারলে না, হাত হতে কেঁপে কেঁপে কাগজখানা মাটিতে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব থাকবার পর, অমরেশ ধীরে ধীরে কাগজটা মাটি হতে উঠিয়ে ধরা-ধরা গলায় বললে—তাহলে আমি চল্লুম। অলকের খবর পেলে আমাদের একবার জানাবেন।

রমা ইতিমধ্যে নিজেকে বেশ একটু শক্ত করে নিয়েছিল। অমরেশ উঠে গেলে রমা পর্দা সরিয়ে একেবারে চৌকাঠ পার হয়ে এসে বললে—শুনুন অমরেশবাবু!···অমরেশ মুখ ফেরাতেই বললে—চিনতে পারেন?

হঠাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হলে, কোনদিক দিয়ে ছুটে পালাবে, মানুষ যেমন স্থির করতে পারে না, রমার অনাবৃত পরিচিত সুন্দর মুখখানা দেখে অমরেশের মনের অবস্থাটা ঠিক সেইরূপ হয়ে গেল। বহুদিন পূর্বে দর্জিপাড়ার মেসে থেকে রমার মুখখানা ক্ষণিকের তরে একবার মাত্র দেখলেও অমরেশ তা ভুলতে পারে নি, তাই নিমেষেই তার সব কথাগুলো এক সঙ্গে মনে পড়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত একদৃষ্টে রমার মুখের পানে অমরেশ তাকিয়ে ছিল, রমা বললে, বোধ হয় মনে পড়ে, একদিন কত অনুনয়-বিনয় করে আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চেয়েছিলুম, আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলেন, আর আজ আমার হাসি পাচ্ছে, আপনি আমারই দরজা থেকে এতটুকু

দয়ার ভিখারী হয়ে জলভরা চোখে ফিরে যাচ্ছেন। আপনার স্ত্রীকে সবকথা বলতে ভুলবেন না যেন।

অমরেশকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই রমা তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আজ সেই অমরেশকে যে হাতের মুঠোর ভেতর পেয়ে এতখানি অপমান করবার সুযোগ পাবে, তা সে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেনি, তাই কিছুক্ষণ ধরে বেশ একটা প্রতিহিংসার আনন্দে তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল—কিন্তু পরে বুঝতে পারলে, তার বুকের বেদনা সে আঘাতের আনন্দের চেয়ে ঢের বেশী ?

বারো

একমুখী দুইটি ঝর্ণার মত রাণী ও অলক পাশাপাশি ছুটেছে। অনীতা দেখত—তারা দুটিতে হাসি ও গানের মত মিলন-বিরহে, আনন্দে অশ্রুতে, কেমন এক অভিনব চিরমিলনের সুর-মূর্ছনায় এতবৃন্তে দুটি ফুলের মত কোন অজানিত মুহূর্তে তার স্বপ্নোদ্যানে ফুটে উঠেছে। রাণী অলকের খেলার সাথী হয়ে কখনও কানামাছি খেলার বুড়ি সেজে কখনও বা তাদের ঝগড়াঝাঁটির বিচারক হয়ে অনীতার দিন-গুলোও মন্দ কাট ছিল না। অলক আর ভিন গাঁয়ে তার মায়ের কাছে যাবার জন্যে আগের মত তত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে না—যদিই বা কখনও সে কথা মনে উঠে, রাণী তৎক্ষণাৎ বলে বসে, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কাজেই তার ভিনগাঁয়ে যাওয়া ঘটে উঠে না। অলক বলে, রাণী তুই মেয়েছেলে আর আমি বেটাছেলে, আমার সঙ্গে তুই অতদূর হাঁটতে পারবি না তো,....পরক্ষণেই আবার নূতন হাসি খেলায় তারা মত্ত হয়ে সে-সব কথা ভুলে যায়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় একজন শিক্ষক তাদের বাড়ীতে পড়িয়ে যান, কাজেই বাকী সময়টা নানারূপ আমোদ আহ্লাদেই কাটে।

হাজার হাসি কান্নার মধ্যে একথাটা অলকের বেশ মনে ছিল যে, পূজার সময় তাকে ভিনগাঁ যেতেই হবে। দেখতে দেখতে পূজার দিন কাছে এল। তারা যে পাড়ায় থাকত, সেই পাড়ারই কিছুদূরে একটা বড় রাস্তার পাশে দুর্গোৎসব হবে। ষষ্টির দিন পর্যন্ত আগের

মত তাদের দিনগুলো বেশ কাটল। সপ্তমীর দিন প্রাতে আগমনীর বাজনা বোজ উঠতেই সানাই-এর করুণ সুরে সুরে অলকের মনটাও কেমন যেন কান্নয়ে ভরে উঠছিল। এমনি করে ভিনগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তো সানাই বেজেছে। দোলা নিয়ে কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বাজিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা গড়ের পুকুরে এতক্ষণ বোধন উৎসব আরম্ভ করেছে, মঙ্গল কলসে আমের শাখা বসিয়ে এতক্ষণ মেয়েরা উলু দিচ্ছে—বিজয়া, রমলা শোভা, টুনী, নূতন জামা কাপড় পরে পথে পথে কলরব করে ছুটে বেড়াচ্ছে,—আর তার মা? সে হয়তো তারই অপেক্ষায় ঘরের দরজায় কলকাতার রাস্তার পানে তাকিয়ে আছে। অলক আর ভাবতে পারলে না। বাণী এসে বললে—অলকদা সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে, চল পূজো দেখে আসি।

অলক কোন কথা না বলে চুপ করে দেওয়ালের একটা ছবির পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

বাণী আবার বললে, ত্যুর ছাই! চ—ল!

অলক বিরক্ত হয়ে বললে, যাঃ—যাব না, তোর কি?

বাণী আরও একটু সরে এসে অলকের হাত ধরে বললে, চল না, মা ডাকছে যে।

অলক টিপ করে বাণীর পিঠের উপর সজোরে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল—দেখলি মজা!

অভিমানে বাণীর চোখ দুটো ছলছল করে এল। ঠোঁট ফুলিয়ে প্রাণপণে কান্না দমন করে বললে, তুমি মর এইখানে, আমি একাই চল্‌লাম।

বাণী চলে গেলে, একা ঘরে বসে অলক মনে মনে অনেকক্ষণ কত কি ভাবল। বাণীর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অলক ভাবল সে বুঝি বা তাকে ফেলে একা একা পূজা দেখতে ছুটেছে, কাজেই তার আর চুপ করে বসে থাকা হল না, ধীরে ধীরে সেখান হতে উঠল ডাকল —বাণী।

কোন উত্তর না পেয়ে পুনরায় ডাকল—রাণী !

এবারেও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বারান্দার নিকট উঠে আসতেই দেখল রাণী উঠানে দাঁড়িয়ে অনীতাকে বলছে, তুমি বলে দাও মা যে, রাণী একা একা চলে গেছে—আমি রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকি। কাকেও কিছু না বলে উপর হতে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে অলক রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, এক কোণে রাণী চুপ করে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। গম্ভীরভাবে অলক রাণীর কানে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বললে, তবে রে ড্যাম, রাস্কেল !

রাণী অলকের হাত টেনে ধরে চীৎকার করে উঠল, দেখ মা আমাকে মেরে খুন করে দিলে···

অনীতা এসে হাসতে হাসতে তাদের বিবাদ মিটিয়ে দিলে।

এইবার রাণীর রাগবার পালা। সে বলল, এখন তুমি যেতে চাইলেও আমি যাচ্ছি না।

অলক বললে, চল না রাণী, আমি আর তোকে কিছু বলব না।

রাণী জিদ ধরে বসল, সে কিছুতেই পূজা দেখতে যাবে না। কাজেই রাণীর রাগ ভাঙাতে অলককে অনেকখানি বেগ পেতে হল। বৈকালে দুজনে পূজা দেখবার জন্য বের হল। সপ্তমী পূজা তখন শেষ হয়ে গেছে। রাত্রে থিয়েটার ও বায়স্কোপ হবে বলে প্রাঙ্গনে একটা মস্ত শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, একপাশে থিয়েটারের ষ্টেজের জন্যে বাঁশ পোঁতা হচ্ছিল। পাড়ার ছেলে মেয়েরা মহা-উৎসাহে চাঁদোয়ার নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাণী ও অলক তাদেরই একপাশে একটা খুঁটির নিকট গিয়ে দাঁড়াল। রাণী খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে, অবশেষে প্রতিমার দিকে নজর পড়তেই ঢিপ করে একটা প্রণাম করলে। অলক চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, রাণী প্রণাম করে উঠে বলল, তুমি প্রণাম করলে না যে অলকদা ?·· ··অলক ঘাড় নেড়ে বললে, না, আমি এখানকার ঠাকুরকে প্রণাম করব না।

রাণী অবাক হয়ে বললে—সে কি ? মা যে বলে দিয়েছে।

অলক কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। রাণী, তাকে আর বেশী কিছু বলতে সাহস করলে না। ভাবলে হয়তো এই এত লোকজনের মাঝে সে এখনই মার খেয়ে মরবে, তার চেয়ে কিছু না বলাই ভাল।

একটা লোক খালি গায়ে, খালি পায়ে সেই রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ প্রতিমা-দর্শদের জন্য একটা প্রণাম করে সেইখানে দাঁড়াল। অলক অনেকক্ষণ হতে এই লোকটির পানে তাকিয়ে ছিল। রাণীকে কাছে টেনে এনে তার কানে কানে বললে, রাণী তুইওকে একটা কথা বলতে পারিস ?

তেমনি ধীরে ধীরে রাণী বললে—কি ?

অলক বললে, ও ভিনগাঁ জানে কিনা জিগ্‌গেস কর দেখি।

রাণী হেসে বললে, ধেৎ, ও কেমন করে জনবে ? ওর কলকাতায় বাড়ী।

অলক একটু রেগে বললে' হুঁ, তুই সব জানিস !······কলকাতার লোক জামা পরে,···জুতো পায়ে দেয় ?

রাণী প্রতিবাদ করে বললে, বাঃ, নীরো-দার চাকর আর-আর সেই মেনীদের বামুন-ঠাকুর—তারা জামাও পরে না, কিচ্ছু না—তবে ?

তুই যা না—বলে অলক রাণীকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে লোকটার দিকে ঠেলে এগিয়ে দিলে।

রাণী ভয়ে ভয়ে দু'-এক পা করে চলছিল, কাজেই সে তার নিকট যেতে না যেতেই লোকটি চলতে শুরু করে দিল এবং নিমেষের মধ্যেই পাশের একটা গলির ভেতর ঢুকে কোন দিকে চলে গেল।

রাণীর এই অক্ষমতার জন্যে অলক তার উপর রাগে গিসগিস করছিল, তাই তাকে আর সেখানে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি তার হাতটা টেনে বললে, চল—বাড়ী চল, সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়ীর নিকট এসে অলক বললে—তুই গেলি নে যে ? রাণী বুঝতে পেরেছিল যে, অলক তার উপর খুবই রেগেছে—তাই কোন

কিছু না বলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল! অলক পুনরায় বললে, বল, কেন গেলি নে?

রাণী আর চুপ করে থাকতে পারলে না, বললে, বেশ করলুম।

বটে!—বলে অলক রাগ সামলাতে না পেরে রাণীর মাথাটা দুই হাতে ধরে বেশ একটা ঝাঁকানি দিয়ে পাশের দেওয়ালের গায়ে ঠাঁই করে ঠুকে দিলে।

অলক বুঝতে পারেনি যে আঘাতটা এত বেশী লাগবে তাই চট্‌ করে রাণীর হাতখানা ধরে সহানুভূতিসূচক করুণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে বললে—ইস্‌! ভাবি লেগেছে, নয় রে?—নাঃ, আর কখ্‌খনো তোকে মারব না।···একটুখানি চুপ করে থেকে অলক আবার বললে, মাকে বলিসনে যেন রাণী!···লক্ষ্মী দিদি আমার!

রাণী ঠোঁট ফুলাচ্ছিল, কাঁদতে পারে নি। চোখ দুটো ছলছল করে এমনিভাবে কান্নায় কান্নায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, মনে হচ্ছিল, অশ্রুর শতধারা গড়িয়ে পড়ে বা। রাণী এরূপ সুযোগ খুব কম পেত তাই ফস্‌ করে বলে ফেলল, বল তুমি আর কোথাও যাবে না, তা হলে আমি বলব না।

অলক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, মাকে বলবিনে তো? আমি কোথাও যাব না।

রাণী তখনও তেমনিভাবে মাথায় হাত দিয়ে অলকের মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অলক না যাবার অঙ্গীকারটা তার নিজের মুখ হতেই শুনে তার বেশ একটু আনন্দ হল। অন্য সময় হলে এরূপ অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদে রাণী হয়তো আনন্দে অবাক হয়ে চীৎকার করে হেসে নেচে, পাড়া মাথায় করত, আজ কিন্তু সে কিছুই করল না—করবার ইচ্ছা থাকলেও প্রাণপণ চেষ্টায় সেটা দমন করল কিন্তু তার সেই ক্ষণপূর্বের জলভারাক্রান্ত বিষাদ মাখা সজল চোখ দুটো হঠাৎ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠায় তার আত্মসংযম নিমেষেই ধরা পড়ে গেল। অলক রাণীর একটা হাত সরিয়ে দিয়ে সুমুখের গ্যাসের

"আলোতে আহত স্থানটা দেখবার চেষ্টা করে বললে, কই দেখি কত লেগেছে ?

অলক দেখল সামান্য একটুখানি রক্ত ফিনকি দিয়ে ক্ষতস্থান হতে বের হয়ে চলে গেছে মাত্র। এখন রক্ত বন্ধ হলেও মাথায় খানিকটা উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে। রাণীর কাঁধে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বললে—চল রাণী চল ছাতে ব'সে গল্প বলবি—দেখছিস চাঁদ উঠেছে—বাঃ, ভারি সুন্দর !

গল্প বলবার লোভ সামলাতে না পেরে রাণী অলকের সঙ্গে ধীরে ধীরে একেবারে ছাতে গিয়ে উপস্থিত হল :

অমরেশকে কলকাতা পাঠিয়ে তার ফেরবার অপেক্ষায় কমলা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বিকালে চারটা আটচল্লিশ মিনিটের ট্রেনে কলকাতা হতে তার ফেরবার কথা, কাজেই দুপুরবেলাটা কোন রকমে কাটিয়ে বিকেল না হতেই কমলা তাদের আসবার অপেক্ষায় একবার দরজার কাছে এসে পথের পানে তাকাচ্ছিল, আবার ঘরে এসে বসছিল। এমন সময় দুধের ভাঁড় হাতে নিয়ে গয়লা-বৌ এসে উপস্থিত হল, বললে এক সের দুধ আনতে বলেছিলে মা, কিন্তু এক পোয়ার বেশী জুটলো না ; কাল থেকে এক সের করেই দেব।

দুধের ভাঁড়টা সরিয়ে রেখে কমলা বললে—বেশ তাই দিও। ছেলেটা আজ কলকাতা থেকে আসবে কিনা গয়লা-বৌ, তাই দুধের রোজ করতে হ'লো—গাইটা দুধ বন্ধ করেছে।

গয়লা বৌ রোয়াকের উপর এসে বললে, হাঁ মা, তা তো বটেই, পূজোর সময় ছেলে ঘরে আসবে—একটু দুধ না হ'লে কি চলে ?... ওমা, এযে দেখছি আমসত্ত করে রেখেছ ছেলের জন্যে ! এই বলে উঠানে রৌদ্রে যেখানে আমসত্ত ও আচার শুকাচ্ছিল, গয়লা-বৌ সেদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুনরায় বললে—তোমাদের

লছোর বাপ যেদিন পত্যি করলে সেদিন এতটুকু আমের আচারের জন্যে সারা গাঁয়ে খুঁজলাম—কোথাও পেলাম না, এমন জানলে···

কমলা বললে, আমার কাছে এলেই হ'তো গয়লা-বৌ! আচ্ছা আজ একটু নিয়ে যেয়ো, দেখো কেমন হয়েছে—বলে কমলা একটা পাতার উপর খানিকটা আমসত্ত ও আচার গয়লা-বৌয়ের হাতে দিয়ে বললে—যখন দরকার হবে নিয়ে যেও বুঝলে ?

গয়লা-বৌ এই দুর্লভ বস্তু দুটি কাপড়ে খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বললে, মুখের সামনে বললে কত লোকে কত কথা কয়, কিন্তু তোমার মতন এমন লক্ষ্মী বৌ ক'জনের হয় মা!···এইবার হরি করুক একটি ছেলে হ'লে সুখের সংসার···

কথাগুলো কমলার কানে গেল কিনা জানি না—সে ধীরে ধীরে আচারের হাঁড়িটা উঠান হতে ঘরে তুলে রাখল। গয়লা-বৌ স্বকার্য সাধন করে উঠে গেলে কমলা মনে মনে একটু হাসল মাত্র।

প্রায় আধঘণ্টক পূর্বে কলকাতার গড়ীটা পার হয়ে গেল, তবু অমরেশ এল না দেখে কমলা ভাবল, হয় তো রাত্রের ট্রেনে আসবে, অলককে পাঠাতে সম্ভবত তারা আপত্তি করেছে—তাই আসতে দেরী হয়েছে।

সন্ধ্যার পর ঘরের মেঝেতে একখানা মাদুর বিছিয়ে কমলা শুয়ে শুয়ে অলকের কথা ভাবছিল, এমন সময় উঠোনে জুতোর শব্দ হতেই তারা এসেছে ভেবে ধড়মড় করে উঠে বসল। অমরেশ শুষ্কমুখে এসে দাঁড়াল—সঙ্গে অলক নেই! কমলা তাড়াতাড়ি মাদুরটা সরিয়ে দিয়ে বললে—অলক এল না ? পাঠালে না বুঝি ?

অমরেশ থপ করে মদুরের উপর বসে পড়েই বললে থাম, বলছি। একগ্লাস জল দাও তো! স্বামীর শুষ্ক মুখখানা এবং কথা বলার ভাবভঙ্গি দেখে কমলা কথাগুলো শুনবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। এদিকে অমরেশও ভাবছিল কেমন করে

এ নিদারুণ দুঃখের কাহিনীটা তাকে বলবে। সারা রাস্তা ভেবে ভেবেও অমরেশ এখনও পর্যন্ত কিছুই ঠিক করতে পারেনি!

খানিকটা জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে অমরেশ বললে—অলকের কথা শুনে আর কাজ নাই কমলা।

কমলা একটু বিস্মিত হয়ে বললে ওমা, সে কি অমঙ্গলের কথা! তাকে পাঠালে না এই তো!

কোনরূপ দ্বিধা সঙ্কোচ না করেই এইবার অমরেশ বললে, পাঠাবে না কেন? অলক সেখানে নেই, আজ মাস দু-তিন হ'লো সে কাউকে না বলে কোথায় পালিয়েছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি গো! সে দুধের ছেলে পালাবে কেমন ক'রে?

হ্যা পালিয়েছে। বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখ—বলে রমার দেওয়া খবরের কাগজখানা পকেট হতে বের করে, কমলার চোখের সুমুখে সেখানা খুলে অঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনের স্থানটা তাকে দেখিয়ে দিলে।

অনেকক্ষণ, ধরে উপর্যুপরি তিন চারবার ভাল করে বিজ্ঞাপনটা পড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অলকের চেহারাখানা দেখে কমলা বলে—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এখনও। মনে হচ্ছে, লুকিয়ে রেখেছে।

অমরেশ গম্ভীর অথচ উদাস ভাবে বললে, তাতে স্বার্থ।

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে তেমনি গম্ভীরভাবে বললে, ভগবান জানেন।

ধীরে ধীরে হাতের কাগজখানা সরিয়ে দিয়ে, ওষ্ঠধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে চেপে ধরা ধরা গলায় কমলা পুনরায় বললে, বেশ হয়েছে, মরুক গে।

অমরেশ কিছু না বলে চাঁদের আলো-ভরা উঠোনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

রাত্রে আহারাদির পর কমলা হঠাৎ অমরেশকে বললে—কাজ

নাই আর এ-সব ঝক্কি-ঝঞ্ঝাটে, তার চেয়ে চল কাশী চলে যাই, মনের শান্তি হবে।

অমরেশও উদাস-চঞ্চল মনে এইরূপ নানাকথা ভাবছিল : সে কমলার প্রস্তাবের কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

কমলা বললে হ্যাঁগা কিছু বলছ না—চুপ করে রইলে যে ?

রমার কথা অমরেশের মনে পড়ল, বললে, একটা মজার কথা শুনবে ?

কি, বল।

কলকাতায় থেকে কলেজে পড়বার সময় দর্জিপাড়ার একটা মেসে একদিন রাত্রে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল এবং আজ রমেশবাবুর বাড়ীতে যা স্বচক্ষে দেখে এবং স্বকর্ণে শুনে এল, বিছানায় শুয়ে একটি একটি করে সব কটাই অমরেশ কমলাকে বললে। সে ভেবেছিল, তা শুনে কমলা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে এবং অনিন্দ্য-সুন্দরী এক যুবতীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবার মত শক্তি ও সংযম তৎকালিন যুবক অমরেশের পক্ষে একটা প্রসংশনীয় ব্যাপার, এ-কথা তাকে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সাগ্রহে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করবার পরও কমলাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমরেশ বললে আজ আস্‌বার সময় সে তোমাকে এ কাহিনীটা শোনবার জন্যে আমায় অনুরোধ করেছিল।

'হুঁ'—বলে অমরেশের বুকের নিকট মুখ রেখে কমলা শুয়ে থাক কোন কথা বললে না! কিছুক্ষণ পরে তেমনি ভাবে মুখ ঢেকে বলে উঠল, হয়তো তারই অভিশাপে তুমি ছেলের মুখ দেখতে পেলে না।

অমরেশ ঈষৎ হেসে বললে, তাই যেন হয় ?

মাঝরাত্রে অমরেশ জাগরিত হয়ে দেখলে, লণ্ঠনটা শিয়রের কাছে তেমনি ভাবেই জ্বলছে, কমলা তখনও পর্য্যন্ত তেমনি মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

তেরো

ক্রমে রমার মনের উগ্র ভাবটা শান্ত সংযত হয়ে ঃ আসতে লাগল। যে ছেলেগুলোকে দেখলে তার সাষ্টাঙ্গ জ্বলে যেত, যারা তার দু'-চক্ষের বিষ ছিল, ক্রমে তাদেরও বেশ ভাল লাগল! সে ভাবছিল, তাদের কোন দোষ নেই—সমস্ত তার নিজেরই অদৃষ্টের দোষ।

বিকেলে রমা আর বেড়াতে যেত না। ইচ্ছা হলে কোনদিন ছাতে উঠে খানিকটা পায়চারি করে ঘুরে বেড়াত মাত্র। সেদিন ছাতে উঠতেই দেখল, একটা ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে এবং তার বোন পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে। রমা একদৃষ্টে তাই দেখতে লাগল। উদ্‌-ভ্রান্তের মত এইসব দেখে দেখে তার মনের সাধ মিটছিল না, ছাতের কিনারে এসে ছেলেটিকে বললে, ঘুড়িটা বেশীদূর উঠছে না খোকা আমার দিকে এগিয়ে দাও, খানিকটা দূরে তুলে দি।

ছেলেটি তাই করল, রমার আনন্দের সীমা রইল না। বললে খোকা আমরা পাশের বাড়ীতেই থাকি, আমাদের বাড়ী আসবে? তোমাকে নূতন ঘুড়ি, মার্বেল, সব কিনে দেব! ছেলেটি আহ্লাদে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, যাব এক্ষুনি।—বলে তার বোনের হাত ধরে টেনে বললে, চল এক্ষুনি যাই।

মেয়েটি রমার মুখের পানে তাকিয়ে বললে আমিও যাব? রমা বললে হ্যাঁ, তুমিও এসো।

তারা আসবামাত্র রমা তাদের কত আদর-সোহাগ করে তখনই

চাকর পাঠিয়ে বাজার হত নূতন মার্বেল, ঘুড়ি, চুলের ফিতে ইত্যাদি আনিয়ে দিল এবং যাবার সময় ছেলেটিকে কোলের কাছে টেনে চুম্বন করে বলে দিল, রোজ এসো তোমরা, বুঝলে খোকা ?

এমনি করে রমা যত ছেলেমেয়ে দেখতে পেত তাদের ডেকে আনতে লাগল এবং তাদের যার যা প্রয়োজনীয় দিতে আরম্ভ করল। হয়তো ফুটপাত দিয়ে একদল ছেলে স্কুল হতে ফিরছে, রমা জানালা হতে তাদের দেখতে পেয়ে চাকর পাঠিয়ে সকলকেই ধরে আনত, মনের সাধ মিটিয়ে তাদের পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াত, আদর-যত্ন করে কাউকে কোলে তুলত, কাউকে চুমা খেত এবং যাবার সময় প্রত্যহ আসতে বলে তাদের বিদায় দিত।

কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, পাড়ার যত ছেলেমেয়ে দিনের মধ্যে প্রায় সর্বক্ষণই তার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে, আদর আব্দার করে কত জিনিস নিয়ে যায়, কত-কি উৎপাত অত্যাচার করে, হাসে খেলে, ঘুরে-বেড়ায়। রমা এই সব দেখে শুনে একেবারে আত্মহারা হয়ে নিজের খাওয়া-পরা ভুলে যায়।

এত করেও তার বুভুক্ষু মাতৃহিয়া শান্ত হচ্ছিল না—এখনও তার মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়েছে ! আরও চায়—আরও চায় ! মাঝে মাঝে দলের মধ্যে হতে দু'-একটা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে একটা নিভৃত নির্জন ঘরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে,—আমাকে একবার 'মা'বলে ডাক খোকা তুমি যা চাইবে তাই দেব। দু'-একজন হয়তো লজ্জায় মুখ ফুটে 'মা' বলে ডাকতে পারত না, আবার দু'-একটা মাতৃহীন বালক প্রলোভনে পড়েই হোক, বা ভালবেসেই হোক, যখন রমার গলা জড়িয়ে 'মা' বলে ডাকত, তখন সেই সব নিতান্ত পরের ছেলের মুখে এই একান্ত পরিচিত 'মা' ডাকটা শুনে তার দুটো চক্ষু জলে ছল-ছল করে উঠত প্রাণে একটা বিরাট শান্তি অনুভূত হতেই একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে পড়ত।

কিছুদিন পরে এই গোপন তথ্যটা প্রকাশ হয়ে যেতেই প্রত্যেক

ছেলে-মেয়ে তাকে 'মা' বলে ডাকতে লাগল। মা-কাঙালী ছেলেগুলো রমার সঙ্গ ছাড়ত না। দু'-একটা মাবাপ-হারা ছেলে তার বাড়ীতে প্রতিপালিত হতে লাগল। রমার মনে হত, তার আর কোন দুঃখ নেই —সে যে আজ বিশ্বজননীর স্থান অধিকার করেছে। এতদিন তার নারী-জন্ম সার্থক হয়েছে।

অলককে তার আর বড়-বেশী মনে পড়ত না। সে যেন তার হারানো-ছেলে অলককে এদেরই মধ্যে খুঁজে পেয়েছে। সে যেখানেই থাকুক, রমার মাতৃ-আশীর্বাদ তাকে সব আপদ-বিপদের মধ্যে নিবিড় ভাবে ঘিরে রাখবে। সে সুখী হোক, এ ভিন্ন এখন রমার অন্য কামনা নেই।

এম্‌নি করে দু-তিনটা মাস পার হতেই রমা কাশী হতে একখানি চিঠি পেল। অপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিখানি খুলেই রমা প্রথমত একটুখানি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। চিঠিখানি অপঠিত অবস্থায় চোখের সুমুখে খুলে রেখে ভাবলে, কোথাকার কি নূতন সমাচার বয়ে এনেছে কে জানে? তাই একটুখানি থেমে, মনটাকে বেশ একটু দৃঢ় করে পড়তে আরম্ভ করলে—

দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারস সিটি

১৫ই পৌষ ১৩৪৮

অপরিচিত বোন্‌টি আমার,

পরিচয় না থাকলেও আজ এই সামান্য চিঠিখানি লিখে জানাচ্ছি যে, আমি এক দুর্ভাগা নারী, একটুকু অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্যে তোমার কাছে এসেছি। পরিচয় না দিলে হয়তো চিনবে না, তাই একটু বলতে হবে। আমিঅলকের 'মা'। যদি কোনদিন তার সন্ধান পাও, তাহ'লে উপরের ঠিকানায় আমাকে একটা খবর দিয়ে তার সাথে একবার শেষ দেখা করিয়ে দিও, লক্ষ্মী দিদিটি আমার! মাত্র এইটুকু —আর কিছু প্রার্থনা নেই বোন্!

আমাব ভালবাসা গ্রহণ ক'রো। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, চিরসুখী হও। ইতি—কমলা দেবী।

চিঠিখানা পড়ে রমা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারা যে মনের অনুরাগে স্বামী-স্ত্রীতে কাশীবাস করবে এ কথা সে কোনদিনই ভাবেনি। ধীরে ধীরে চিঠিখানি বন্ধ করে বাক্সের মধ্যে তুলে রেখে রমা অন্যত্র চলে গেল।

অনিতা প্রথম থেকেই ভেবেছিল, রাণীর সঙ্গে অলকের বিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে। অলক যে কি জাতি এবং কোথাকার কে, তার সঙ্গে রাণীর বিয়ে দেওয়া কুলাচার সঙ্গত হবে কিনা, এ প্রশ্ন কোনদিনই তার মনে উদিত হয়নি। এই সব অপ্রাসঙ্গিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে গিয়ে তাদের এই বিধিদত্ত অযাচিত মিলনে বাধা দেবার ক্ষমতা তারও ছিল না। কিন্তু অলক যে বলছে, ভিনগাঁয়ে তার মা আছে! তাঁকেও তো একটা সংবাদ দিয়েই তার সম্মতি নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অনিতা একদিন অলককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, অলক তোর মামার নাম কি?

অলক ঘরের মেঝেতে রাণীকে নিয়ে মার্বেল খেলছিল, বললে,—অমরেশ রায়।

অনিতা সেইদিনই অলকের মামাকে জানল যে, অলক তার কাছে আছে; যদি তাকে নিয়ে যেতে চান, তা হলে তিনি নিজে এসে যেন তাকে নিয়ে যান। অনিতা একবার ভাবলে, চিঠিখানা আরও বহু পূর্বে লেখা উচিত ছিল। আচ্ছা, যদি তার মামা এসে তাকে নিয়েই যায়, তাহলে কি হবে? এইসব নানা কথা ভেবে, অনিতা একবার মনে মনে স্থির করলে, চিঠিখানা না লেখাই ভাল; কিন্তু সেটাও যেন তার অন্যায় মনে হতে লাগল তাই শেষপর্যন্ত আর বেশী কিছু না ভেবে চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়ে দিলে। অলকের মত পুত্র হারিয়ে যে-জননী ভেবে মরছে, চিঠিখানা পেয়ে তার উৎকণ্ঠিত মনে যে অপরিসীম আনন্দ হবে, এতদিন পরে হঠাৎ সে কথাটা অনিতার মনে হতেই

চিঠিখানা পাঠাতে তার আর কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ রইল না—বরং এতদিন সে অলকের কোন সংবাদই তাকে দিতে পারেনি, এই অপরাধটাই তার অমার্জনীয় বলে মনে হতে লাগল···

সেদিন স্নান করবার সময় কলকাতায় চৌবাচ্চার কাছে রাণী দাঁড়িয়েছিল, অলক ছুটে এসে তার হাত ধরে টেনে বলল, আয় ভাই, আমরা দু'জনে চৌবাচ্চায় সাঁতার কাটি, কেমন ?

না, মা বকবে !—বলে রাণী শীতে কাঁপতে কাঁপতে সরে দাঁড়িয়ে বললে, না ভাই, চুল ভিজে যায় যদি ?

অলক খপ্ করে তার চুলের গোছাটা ধরে টান মেরে বললে,—চুল ভিজবে, না শীত করবে, বল ? বাঃ শীত-কাতুরে !···আয়, আয়, তুই না-হয় এইখানে এমনি করে' দাঁড়িয়ে থাক, আমি তোর পিঠের উপর পা দিয়ে কাঁধে উঠে ঝপাং করে' জলে ঝাঁপ দি, দ্যাখ কেমন মজা ! জলগুলো চিচিং করে লাফিয়ে উঠবে।

রাণী ইতস্ততঃ করছিল, অলক পিছল উঠোনের খানিকটা পা টিপে ধীরে ধীরে পার হয়ে বললে,—আচ্ছা, তুই কোথাও যাস্ নে, আমি দৌড়ে গিয়ে উপর থেকে গামছাখানা নিয়ে আসি।

অলক তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল। রাণী ততক্ষণ কলতলার ঠাণ্ডা হতে কাঁপতে কাঁপতে সরে এসে উঠোনের একপাশে রৌদ্রে এসে দাঁড়াল। এমন সময় সদর দরজার কড়া নেড়ে পিয়ন ডাকলে, চিঠি হ্যায় !—

আব্রুর বালাই এ বাড়ীতে বড় একটা ছিল না, কাজেই রাণী সাগ্রহে দৌড়িয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই পিয়ন একখানা অসংখ্য ছাপমারা খামের চিঠি তার হাতে দিয়ে চলে গেল। খামখানা পোষ্ট-অফিসে-অফিসে ঘুরে আষ্টে-পৃষ্ঠে এমনিভাবে চক্র-লাঞ্ছিত হয়ে এসেছিল যে, তার একটা দিকের একটুখানি সাদা দেখতে পাওয়া যায় না, আবার তারই মধ্যে মধ্যে পিয়ন ছোট ছোট করে কত-কি লিখেছে। খামখানা খোলা এবং শিরোনামের দিকে আর একটা

লাল রঙের কাগজের উপর ইংরেজীতে যে কি লেখা ছিল, রাণী কিছুই পড়তে পারলে না। এই অদ্ভুত চিঠিখানা হাতে পেয়েই রাণীর পড়বার ইচ্ছা হল। খাম হতে চিঠিখানা বের করে পড়বার উদ্যোগ করতেই অলক তড়াক্ করে সিঁড়ি হতে নেমে খপ করে রাণীর হাত হতে খামখানা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, কার চিঠি রে!—আমার বুঝি?

যদিও অলকের নামে আজ পর্যন্ত কোন চিঠিই এ বাড়ীতে আসেনি এবং সেও একখানি চিঠি কাউকেও দেয়নি, তথাপি পলাতক এবং নিরুদ্দিষ্ট অলকের বালক-মন কেবলমাত্র এমনি একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ আগমনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকত। কার নামে চিঠিখানা এসেছে দেখবার জন্য অলক খামটার দিকে তাকাতেই দেখল, ছাপে খমটা ভরে গেছে।

তার ভেতরের ছোট লেখাগুলো পড়বার চেষ্টা করলে প্রথমেই যে-নামটা চোখে পড়ল, তাতে তার বেশ আনন্দ হল, কিন্তু পরক্ষণেই গোটা লাইনটা পড়তেই সে চমকে উঠে একেবারে কাঁদ-কাঁদ হয়ে পড়ল। পিয়ন লিখেছিল,—অমরেশ রায় ও তার স্ত্রী বাড়ী ছেড়ে কোথায় চলে গেছে, কেউই বলতে পারে না, মতে ফেরৎ।

আসল চিঠিখানা কে দিয়েছে, কি লেখা ছিল বা কোথা হতে ফিরে এল—এ-সব কথা ভাববার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। সে শুধু ভাবছিল, তার মা ও মামার কথা। বাড়ী ছেড়ে কোথায় গেছে তারা? আর কি সে তাদেরকে দেখতে পাবে না?

অনিতা রান্নাঘর হতে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসেছিল, রাণী বললে, —মা, একখানা চিঠি এসেছে।

রাণীর কাছ থেকে চিঠিখানা এবং অলকের কাছ থেকে খামখানা নিয়ে অনিতা বুঝল, তারই চিঠি তার কাছেই ফিরে এসেছে। খামের উরর ডাক পিয়নের মন্তব্যটা পড়ে তার আর বুঝতে কিছু বাকী রইল না।

হঠাৎ চিঠিখানা হাতে নিয়ে অলক কেন যে এত গম্ভীর হয়ে গেল রাণী কিছুই বুঝতে পারছিল না। চিঠিখানা কার কাছে থেকে এসেছে রাণী তাও বুঝতে পারেনি। কাই সে হাসতে হাসতে বললে, —এস অলক দাদা, আমি তেমনি করে' দাঁড়াই, তুমি সাঁতার কাটবে এসো।

আকস্মিক এই দুঃসংবাদে আগেকার মত আনন্দ উৎসাহ অলকের একেবারেই ছিল না। ধীরে ধীরে কলের কাছে গিয়ে একটুখানি জলে গা-হাত মুছে বললে,—আজ আমি যদি সাঁতার না কাটি, তোর কি ?

ভয়ে ভয়ে রাণী আর বেশী কিছু বলতে পারলে না।

তাদের আহারাদির পর অনিতা খেতে বসল, অলক একবার ভাবলে এই অবসরে সে এ বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। ভিনগাঁয়ে তার মা যদি না থাকে, তা হলেও তো সে গাঁয়ের লোকের কাছে একটা খবর পাবে তারা কোথায়, তাকে যেতেই হবে। প্রথমতঃ ভাবল, রাণীকে কোন কথা বলে যাবে না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল রাণীকে না বলে সে কোনপ্রকারে এ বাড়ী ছেড়ে এক পা নড়তেও পারবে না! রাণীকে বললে, যদি সে না শোনে, দৌড়ে তার কাছে পালিয়ে যাবে। বাড়ী পৌছে তাকে একখানা চিঠি দিলেই চলবে। সে তো এ বাড়ীর নম্বর ও রাস্তার নাম জানে। সেই ভাল।

রাণীর হাত ধরে অলক তাকে আস্তে আস্তে বাড়ীর বাইরে নিয়ে এল। গলিটা পার হয়ে সার্কুলার রোডের কাছে এসে দাঁড়াতে রাণী প্রশ্ন করলে—কোথা যাবে অলক দা, এই রোদের সময় আমার হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছে!

অলক গলাটা পরিষ্কার করে বললে,—আয় একটু আর—বলছি। রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে গিয়ে অলক রাণীর একটা হাত ধরে বললে,—আমি চললুম রাণী, আর আমি এখানে কিছুতেই থাকব না—তোরা আমায় ভুলিয়ে রেখেছিস।…মাকে বলে দিস, বুঝলি!

না তুমি যেতে পাবে না।—বলে রাণী নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অলকের হাতটা জোর করে ধরল।

ছেড়ে দে রাণী আমি মাকে দেখেই আবার ফিরে আসব—যেয়েই তোকে চিঠি দেব—বলে অলক হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে হন হন করে সোজা চলতে লাগল।

রাণী কি বলবে, কেমন করে তাকে ধরে রাখবে কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু উদাস কাতর দৃষ্টিতে সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল! অলক চলে যাচ্ছিল, হয় তো আর ফিরবে না ভেবে রাণী একটু তাড়াতাড়ি চলে তার সঙ্গ নেবে মনে করে পিছু পিছু চলতে আরম্ভ করল।

অলক কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল রাণীও আসছে। হাতের ইসারা করে একটু জোরে জোরে বললে, আসিসনে বলছি—আমি কিছুতেই ফিরব না।

রাণী তার নিষেধ না শুনে এইবার দৌড়াতে আরম্ভ করল। অলকও দৌড়ল। অলক যত যায়, রাণী তত যায়। সেই রৌদ্রে একপিঠ চুল খুলে রাণী দৌড়াতে পারছিল না, তার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিল, নিশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হচ্ছিল, ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে চীৎকার করে বললে, অলক দাদা দাদা—দাদা যেয়ো না তোমার পায়ে পড়ি।

রাস্তার একটা ছ্যাকড়া গাড়ী ও মোটরের বিকট শব্দে রাণীর কাতর মিনতি কোমদিকে ডুবে গেল। অলক তখন অনেকদূর চলে গেছে।

একদৃষ্টে অলককে লক্ষ্য করে রাণী ছুটদিল পথের দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ একটা পাকা কলার খোসায় পা পিছলে কাপড়ে পা জড়িয়ে ফুঠপাথের ওপর দড়াম করে রাণী আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। সামলাতে না পেরে রাণীর হাঁটু ও কনুইয়ের খানিকটা ছিঁড়ে রক্ত বের হয়ে গেল—কপালের উপরে একটা জয়গা কেটে

ঝর্ঝর্ করে মুখের উপর রক্তের ধারা গড়িয়ে এল। উ, মাগো! বলে রাণী ধীরে ধীরে ফুটপাথের উপর উঠে বসল। রক্তের দিকে তখনও তার লক্ষ্য ছিল না, তখনও সে একদৃষ্টে দেখছিল, অলক কত-দূরে গেল। অতি কষ্টে সে ধীরে ধীবে উঠে দাঁড়াল। দু এক পা চলল বটে, কিন্তু আর ছুটতে পারল না, হাঁটুর বেদনা টনটন করে উঠল। নিষ্ঠুর অলক একবার ফিরেও চাইল না! রাণীর বুক ফেটে যাচ্ছিল —মনে হচ্ছিল, মোটর গাড়ীগুলো অলককে এখনই ধরে ফেলতে পারে, কিন্তু সে কাকে বলবে, কেই বা তার কথা শুনবে? পথের পাশে একটা টেলিগ্রাফ পোষ্টের গায়ে হেলান দিয়ে অতি কষ্টে রাণী দাঁড়িয়ে রইল একবাব প্রাণপণ চেষ্টায় চীৎকরে অলককে ডাকবার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু চীৎকার করতে গিয়ে দুরন্ত অভিমানে তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। অস্ফুট কাতর কণ্ঠে কেবল একটি কথা বের হয়ে এল দাদা! কথাটা কিন্তু পাশের লোকেও শুনতে পেল না। রাণীর চোখ দুটো তখন জলে ভরে কানায় কানায় উছলে পড়েছে—কপালের বক্তেব ধারা গড়িয়ে এসে অশ্রুর সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

চোদ্দ

কিসের একটা দুর্নিবার ইচ্ছা অলককে কেবলই সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল। যে রাণীকে সে এত ভালবাসে, এতদিন ধরে যে তার সব কাজে সব স্থানে একমাত্র সঙ্গিনীরূপে সাথে সাথে ফিরেছে, আজ সে কেমন করে তাকে ছেলে চলে যাবে—তার প্রতি এত নিষ্ঠুর সে তো আগে কোন দিনই হতে পারেনি।

তবুও কেমন যেন একটা মুক্তির আনন্দ তাকে ক্রমশঃ হর্ষোৎফুল্ল করে কোন এক বিরাট উন্মুক্ততার দিকে টেনে নিয়ে চলেছিল। কোথাকার এ অজানা আকর্ষণ—সে নিজেই জানে না যে! অলক একবার পেছন ফিরে দেখলে, রাস্তার লোকজন এবং গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ে রাণীকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন এক একবার তার মনে হচ্ছিল, কাজ নাই ভিনগাঁ গিয়ে—যদি যেতে হয়, রাণীকেও নিয়ে যাবে-কিন্তু পরক্ষণেই অন্য একটা চিন্তা তার মনে আসতেই অলক মাত্র একটা নিশ্বাস ফেলে আবার চলতে আরম্ভ করল। সোজা না গিয়ে একটা গলির মোড় ফিরতেই কত কথা তার মনে হতে লাগল—মনে হল রাণীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন সে ঠিক এই রাস্তা ধরেই পলাতক আসামীর মত রমেশবাবুর বাড়ী হতে চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিল, আজও আবার সেই পথ দিয়েই হাঁটছে। এতক্ষণে তার মানে হতে লাগল, ভিনগাঁয়ের রাস্তা সে তো জানে না—এমন কি, এতদিনের অভিজ্ঞতায় সে বেশ বুঝেছে যে, কলকাতার কোন লোকই সে সংবাদ দিতে পারবে না। তবে—তবে সে কি করবে?....তাকে যে যেতেই

হবে! চিঠির উপর পিয়নের মন্তব্যটাই তার বুকে বার বার কাঁটার ঘায়ের মত খচ খচ করে উঠছিল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। মা যে তাকে ছেড়ে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যাবে—সে বিশ্বাস করে না—করবে না! তার ইচ্ছা হচ্ছিল, হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়ে সে ভিরগাঁ যাবে।—পায়ে হেঁটে তো পৌছতে পারবে না!

আপন মনে অনেকটা পথ অতিক্রম করে অলক একেবারে ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে এসে পড়ল। চলতে চলতে পথটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল—এ্যাঁ এ কি। পথের পাঁশেই রমেশবাবুর সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি পড়তেই পা দুটো হঠাৎ থেমে গেল। যেখান হতে সে জ্যেঠিমাকে লুকিয়ে পালিয়ে গেছিল, আবার সেই পরিচিত বাড়ীর সুমুখেই এসে পড়েছে। খানিকক্ষণ ফুটপাথের উপর একটা পোষ্টের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে অলক ভাবল, সে লুকিয়ে এ স্থানটা পার হয়ে যাবে কিনা। আবার ভাবল, এতদিন তার কোন খবর না পেয়ে তার মা ও মামা ভিনগাঁ হতে এখানেও তো আসতে পারেন! আর একটা কথা সর্বশেষে মনে পড়তেই অলকের বালকমনটাও আঘাত পেল! তার জ্যেঠিমাও তো তাকে কম্ ভালবাসত না! সে-ও হয়তো এতদিন তাকে না দেখত পেয়ে কেঁদে মরছে! একবার দেখা করে সব খবর নিয়ে যেতেই বা দোষ কি? আর তো কেউই তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। আবার যদি তাকে পূর্বের মত আবদ্ধ থাকতে হয়, তা তা হলে সে কাউকেও না বলে আবার পালিয়ে যাবে!

এমনি-সব নানাকথা ভাবতে ভাবতে অলক এক-পা করে অগ্রসর হচ্ছিল। দরজার কাছে এসে দেখলে, লোকজন কেউ কোথাও নেই। ধীরে ধীরে ফটক পার হয়ে সিঁড়ি ধরে অলক উপরে উঠে গেল। কোনদিকে না তাকিয়ে, সে আগে যে ঘরটায় থাকত সেই ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখলে, ঠিক আগেকার মত জিনিসপত্র সব তেমনিই কাছে। তার পুরানো বইএর বাক্স, এমন কি টেবিলখানাও কেউ সরিয়ে রাখেনি। ঘরের এককোণে একটা নূতন

জিনিসের আমদানী হয়েছে—একখানা টেবিল-হারমোনিয়াম। রাণীদের বাড়ীতে এইরূপ নূতন ধরণের হারমোনিরাম সে প্রথম দেখেছে, তাই জিনিসটা চিনতে তার দেরী হল না। রৌদ্রে এতটা রাস্তা হেঁটে এসে অলক বড় বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং বাড়ীটায় ঢুকে একদিকে যেমন তার মনে সামান্য আনন্দ হচ্ছিল, তেমনি আবার রমেশবাবুর মুখখানা মনে পড়তেই আতঙ্কও হচ্ছিল: হঠাং তার জ্যেঠিমা ঘরে ঢুকে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে—এই ভেবে অলক একটা বড় পাশবালিশের একপাশে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল।

বিকেলের কিছু আগে রমা এই ঘরে ঢুকে একেবারে রাস্তার দিকের বড় জানালাটার পাশে দাঁড়াল একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দ ও আতঙ্কে অলকের মনের অবস্থাটা এমনি এলোমেলো হয়ে উঠেছিল যে, এতক্ষণ ধরে বালিশের পাশে নিঃশব্দে চোখ বুজে মুখ গুঁজে পড়ে থেকেও ঘুমিয়ে পড়েনি—কাজেই রমার আগমন সে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। রমা মুখ ফেরাতেই বিছানার উপর শায়িত অলকের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। আজ হারানো অলককে এমনি করে বিনাক্লেশে নিজের ঘরে ফিরে পেয়ে রমার মনে যতখানি আনন্দ হওয়া উচিত ছিল তার ভাবভঙ্গিতে সে আনন্দের বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পেল না। হঠাৎ এক চমকে উঠে রমা বিছানার কাছে এসে একেবারে অলকের উপর ঝুঁকে পড়ে ভাল করে তাকে দেখে নিল। সে ঘুমিয়েছে ভেবে সে তাকে নাড়া দিয়ে উঠাল না—চীৎকার করেও জাগাল না। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে মুখের পানে তাকিয়ে থেকে অতর্কিতে রমার চোখ দুটো জলে ভরে এল। তার সন্তান-পিয়াসী মাতৃহিয়ার অনির্বাণ বুভুক্ষার অশান্ত বিক্ষোভ পড়ার অনাথ ছেলে-মেয়েদের জননী হয়ে শান্ত-সুন্দর হয়ে উঠেছিল, তাই সে অলককে আর সেই পূর্বের কাঙাল মন দিয়ে আকুল-আগ্রহের ব্যাকুল-দৃষ্টি দিয়ে দেখল না, বরং কল্যাণময়ী মাতার স্নিগ্ধোজ্জ্বল

শান্ত ও মুগ্ধ নয়নের পূত আনন্দাশ্রুর নির্মাল্য দিয়ে তার শাশ্বত পুত্রকে বরণ করে নিল।

সে যে এক অলককে হারিয়ে হাজার অলককে নিবিড় আলিঙ্গণে তার বেদনাক্লিষ্ট বুকের ওপর জড়িয়ে ধরেছে! ক্রন্দ-বিষজর্জরিত-কণ্ঠের গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণভার সরিয়ে দিয়ে তার প্রাণের ক্রন্দনী যে অবরুদ্ধ স্বাধীন সত্যবাণী প্রচার করে দিয়েছে, তা তো নিমেষেই মিথ্যা হতে পাবে না। জননী হবার অধিকার সব ছেলে মেয়ের কাছেই আজ তার সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে—কোথাও এতটুকু পক্ষপাতিত্ব নেই।

এখনই হয় তো দুরন্ত ছেলের দল এসে ঘর ভরে ফেলবে, চীৎকার করে অলকের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে বিরক্ত করে তুলবে। রমা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ভজুয়াকে ডেকে বলল,—শ্যাম সিংকে বলে দে, আজ যেন ছেলে-মেয়ের দল ঘরে এসে আমার জ্বালাতন না করে—তাদিকে আব একদিন আসতে বলে দিয়ে আয় বাবা! ভজুয়া হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এখনই হয়তো সেই আকালে ছেলেগুলোর জ্বালায় তাদের আজগুবি ফাই-ফরমাশ জোগাতে জোগাতে ভজুয়াকে অস্থির হতে হত—কাই সে মহানন্দে বগল বাজাতে বাজাতে এবং আহ্লাদে নাচতে নাচতে এই শুভ সংবাদ শ্যাম সিং দারোয়ানের কাছে প্রচার কববার জন্যে চলে গেল।

রমা ঘরে ঢুকেই প্রথমে ভাবল, এখন তর কি করা উচিত। কাশীতে কমলা ও অমবেশেকে একখানা জরুরী টেলিগ্রাম করা দরকার। তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে গিয়ে হাত বাক্সটা খুলে, কমলা চিঠিখানার ঠিকানাটা দেখে নিয়ে, তাদের কোন এক বিশেষ কাজের জন্যে আসতে বলে রমা টেলিগ্রামের একখানা ফরমের উপর চরচর করে কয়েকটা কথা লিখে ফেলল। ছুটি টাকা সমেত টেলিগ্রামখানি আর একটা চকরের মারফৎ পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে রমা ভাবল, আজ টেলিগ্রাম করলে কাল প্রাতেই তারা পাবে, কালই

যদি রওনা হয়, তা হলে পরশু সন্ধ্যা নাগাদ কিংবা তার পরদিন প্রাতে তারা এখানে এসে পৌঁছবে নিশ্চয়। আঃ বাঁচা গেল! একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে রমা আবার অলকের কাছে এসে দাঁড়াল। অলক তখনও পূর্ববৎ নিশ্চলভাবে মুখ চোখ বুজে শুয়ে ছিল। তার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকাতে তাকাতে রমার চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে এল—বুকের ভেতর কিসের একটা তিক্ত ক্রন্দন হা-হা করে উঠতেই রমা ঝুঁকে পড়ে ঘুমন্ত অলকের বক্তিম গণ্ডের উপর ধীরে ধীরে একটি চুম্বন করল। অলক জেগে ঘুমোচ্ছিল' কাজেই আর চুপ করে থাকতে পার'ত না দুটি হাত বাড়িয়ে বমার গলাটা জড়িয়ে ঘরে চোখ খুলে মাত্র একটু হাসল, মুখে কোন কথা বলতে পাল না হঠাৎ হাসির পরিবর্তে রমার চোখ বেয়ে অশ্রুব ধারা গড়াচ্ছে দেখে অলক একটু দমে গেল, খানিক নীরব থেকে বললে, আমি তো জেঠীমা তোমার উপর রাগ করে' পালিয়ে গিয়েছিলুম।

বালকের এই হাস্যোদ্দীপক কথাটা শুনে রমা বললে বেশ ছোল বাবা! কোথায় ছিলে এদ্দিন?···

এতদিন তার গোপনবাসের কথা উত্থাপিত হওয়ায় রাণীকে অলকের মনে পড়ে গেল। বললে কোথা ছিলুম? সে এক তোফা আরামে।—রাণীদের ঘরে! রাণী আব তার মা···আর কেউ না। উ-ই কলকাতার একেবারে এক-ধেরে।

রমা আশ্চর্য হয়ে বলল—কলকাতাতেই ছিলি? রাণী কেরে?···

রাণীকে তুমি যদি দেখতে জেঠী-মা, তাহলে তাকে আর কখনো ভূলতে পারতে না—সে এমন মেয়ে! এত লেখাপড়া জানে যে, আমাকে ফেল ক'রে দেয়—ভূগোল, জ্যামিতি, মাননঙ্ক, রয়েল-রীডার সব।

তবে তা'দিকে ছেড়ে চলে' এলি কেন?

অলক বাধা দিয়ে বললে, বাঃ, চলে আসব কেন? মায়ের জন্য

মন কেমন করছিল পালিয়ে এলাম।···তারা কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছিল না যে।···রাণী তো কিছুতেই না। আমার পিছু পিছু অনেকদূর এসেছিল—বাপ্ স—সে ক—ত দূর।

তুই তাদের ঠিকানা জানিস ?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এই ধর পঁচিশ, তারপর একটা দাড়ি, তারপর দুই, তারপর ইংরাজীতে 'এ,' আর রাস্তাটার নাম উদয়বাবু লেন।

ঠিকানা বলবার অপরূপ ভঙ্গি শুনে রমা একটু হাসল অলক তখনও তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। রমা আবার মাথা নুইয়ে তাকে চুম্বন করে ধীরে ধীরে বললে, আচ্ছা, রাণীকে একখানা চিঠি দিও—আমি তোমার খাবার দিয়ে আসি। বলে রমা সেখান হতে চলে যাচ্ছিল, অলক বললে—মা আসে নি এখানে ? ··আমায় কাল ভিনগাঁ পাঠিয়ে দিতে হবে কিন্তু ! নইলে—

রমা ঈষৎ হেসে বললে, নইলে আবার পালিয়ে যাবি, নয় ? আচ্ছা, পাঠিয়ে দেব। বলিয়াই সে বের হয়ে হয়ে গেল।

ভিনগাঁ যাবার জন্য অলক যতই চঞ্চল হচ্ছিল, রমা ততই তাকে প্রবোধ দিচ্ছিল, আজকের দিনটা থেকে যা বাবা আর তো তোকে দেখতে পাব না। কাজেই সেদিন আর অলকের যাওয়া হল না। তার পরদিনও না।—কারণ, সেদিন ছিল বৃহস্পতি বার, যাত্রা নিষেধ।

রমা মনে ঠিক করে রেখেছিল যে, তার জরুরী টেলিগ্রামখানা পেয়ে কমলাও অমরেশ বেনারস হতে কলকাতা যাত্রা করবে। যেদিন তাদের আসবার সম্ভাবনা, সেদিন দুপুরে রমার হঠাৎ মোটরে বেড়াতে যাবার সখ চড়ল। সোফারকে মোটর আনতে আদেশ দিয়ে বাড়ীর দাসী-চাকর সকলকে ডেকে বলে দিল, ফিরতে দেরী হতে পারে, অলকের উপর যেন তাদের কড়া নজর থাকে।

সোফারকে বরাবর সার্কুলার রোডে মোটর চালাবার আদেশ দিয়ে রমা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি উদয়বাবুর লেন জান ড্রাইভার ?

সোফার আশ্বাস দিয়ে বললে, চলুন জিজ্ঞাসা করে, নেওয়া যাবে

পথে একজন পোষ্ট-অফিসের পিওনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে আঙ্গুল নির্দেশ করে দেখিয়ে বলল, বৌবাজার পার হয়ে যেতে হবে।

আরও দু-এক জায়গায় মোটর থামিয়ে দু'-একটা লোককে জিজ্ঞাসা করে অবশেষে অতিকষ্টে ড্রাইভার উদয়বাবুর গলির মোড়ে মোটর থামল।

রমা মোটর থেকে নেমে গলির ভেতর কিছুদূর যেতে-না যেতেই অলক বর্ণিত ২৫।২ এ নম্বরের বাড়ীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল। দরজার কাছে বিষন্ন বদনে একটি ফুটফুটে মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রমা বুঝল, এ-ই রাণী। বললে—খুকী বাড়ীতে মা আছে তোমার?

রাণী ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ।

চল। তোমার মায়ের কাছে যাই একবার। বলে রমা তার হাত ধরে ঘরের ভেতর গিয়ে উপস্থিত হল। অনীতা ঘরের মেঝের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানা বই নিয়ে পড়ছিল এবং পুস্তকের ছত্রে ছত্রে সেই দুরন্ত সব-ভুলানো ছেলে অলকের মুখচ্ছবির প্রতিচ্ছায়া দেখছিল। অপরিচিতা অভ্যাগতের আগমনে তাড়াতাড়ি বইখানা ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে অনীতা রমার মুখের পানে বার কতক তাকিয়ে বললে, বেড়াতে এসেছেন এ গরীবের বাড়ী?—আসুন। বলে ঘরের কোণ হতে একখানা মাদুর এনে সসম্ভ্রমে মেঝের উপর বিছিয়ে দিতে যাচ্ছিল। রমা অনীতাকে বাধা দিয়ে বললে, আমি বসব না ভাই আমার বাড়ীতে ব্রত, তাই আপনাদের মা-টিকে একটু জল খাওয়াবার জন্যে ডাকতে এসেছি চলুন, যেতে হবে এক্ষুণি, আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

এমন অনেক পাড়াপশীর মেয়ে তার বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসত এবং এবাড়ী-সেবাড়ী যাবার জন্যে অনুরোধও করত কিন্তু অনীতা বড় একটা কারও বাড়ী যেতে ভালবাসত না। অলক চলে যাবার পর হতে মনের অবস্থাটাও তেমন ভাল ছিল না, কাজেই রমার অনুরোধ অনীতা প্রথমত ইতস্তত করছিল, কিন্তু রমা

ছাড়বার পাত্রী নয়--রাণীকে যে নিয়ে যেতেই হবে! রমা বললে, কোন কথা শুনব না ভাই, বাড়ীতে অন্য লোক না থাকে, ঘরে তালা-চাবি বন্ধ করেও যেতে হবে।···আমার অনেক দিনের মনের সাধ!

অলক চলে গেল, অথচ দুদিন না যেতেই এই যে এক অপরিচিত মহিলার আগমন, শুধু আগমন কেন, তার রাড়ীতে ব্রতের অছিলা করে এমন অসময়ে তাদের নিয়ে যাবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ অন্য সময় হলে অনীতা বেশ বুঝতে পারত, অন্ততঃ এই রমাকে অলকের কোন আত্মীয়া বলে সন্দেহও হত, কিন্তু অনীতা তখন শুধু একটামাত্র চিন্তায় বিভোর ছিল—অন্য কিছু ভাববার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। সে ভাবছিল, এই-যে এই যে একটা জলস্রোতের মত অলক এসে তার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দু'দিনমাত্র তার স্নিগ্ধ ধারার কলগীতি শুনিয়ে আবার কোথায় উধাও হয়ে গেল—পশ্চাতে রেখে গেল সাহারার তপ্ত বালুকার হা হুতাশের মতই একটা স্মৃতির জ্বালা! বসন্তের কোকিলের মত দুদিনের গান শুনাতে কেন এসেছিল সে? রাণীও তো তার সাথীর অদর্শনে ম্রিয়মান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাব মনেও তো সুখ নেই! পড়শীর বাড়ীতে দু'দণ্ড বসে গল্প করলেও হয় তো কতকটা শান্তি পাবে ভেবে অনীতা রমার সঙ্গে যেতে স্বীকৃত হল। রাণীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উভয়ে মোটরে বসতেই রমার ইঙ্গিতে মোটর-চালক সশব্দে সার্কুলার রোডের মধ্য দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিল। মোটরটা হু-হু শব্দে বৌবাজারের মধ্য দিয়ে অনেকটা রাস্তা চলে আসার পর, অনীতা বললে, এ যে অনেকদূর! বাড়ীতে তালা বন্ধ করে এলুম—একটু শীঘ্রি ফিরতে হবে কিন্তু।

'এই যে আর বেশী দূর নয়', 'আর একটুখানি' 'এবার এসে পড়লুম'—এমনি সব নানা কথার পর গাড়ী যখন ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে রমার বাড়ীর ফটকে এসে উপস্থিত হল, তখন রমা একটা হাঁফ ছেড়ে রাণীকে হাতে ধরে মোটর হতে নামিয়ে বললে, এই যে এসে পড়েছি।

ভজুয়া রমাকে সংবাদ দিল, আপনি বেরিয়ে যাবার পরেই বেনারস থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন।

রমা উদ্বিগ্ন হয়ে ভজুয়াকে একটু দূরে সরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, সঙ্গে আর কে আছে? কোথায় বসিয়েছিস? ভজুয়া হস্ত-সঞ্চালন করে বিশেষ দক্ষতা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, সে সব ঠিক আপনি যা বলে' গিয়েছিলেন তাই করেছি। তারা নীচের ঘরে অপেক্ষা করছেন—সঙ্গে একজন মেয়ে-মানুষ আছে।

রমা পুনরায় বললে, অলক কোথা?

এখনও ঘুমাচ্ছে—বলে ভজুয়া বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্যে অগ্রসর হতেই রমা বললে, চল আমি এঁদিকে নিয়ে যাই।

রাণী ও অনীতা ফটক পার হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে দিল—রমা তাদেরকে নিয়ে নীচের ঘরে যেখানে অমরেশ ও কমলা অপেক্ষা করছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

কমলাকে যথারীতি অভিবাদন করে, অমরেশকে সেই ঘরেই অপেক্ষা করতে বলে, অনীতার হাত ধরে রমা উপরে উঠে গেল—রাণী তাদের পশ্চাতে যেতে লাগল।

অলক যে-ঘরে ঘুমোচ্ছিল, সে ঘরে তাদের না নিয়ে গিয়ে, আর একটা ঘরে কমলা ও অনীতাকে বসিয়ে রমা নিজেই জলখাবারের থালা দুটো তাদের সুমুখে ধরে দিল। রাণী আর একটা থালায় খাবার দিয়ে যত্ন করে খাওয়াতে আরম্ভ করে দেখলে, কমলা চুপ করে বসে আছে। রমা বললে, কর্তাটিকে সঙ্গে আনলুম না বলে' কি তোমারও খাওয়া হবে না দিদি? খেয়ে নাও, চাকরে তাঁর খাবার দিয়ে এসেছে।

কমলা একটু হেসে অগত্যা খেতে আরম্ভ করল। রমা বললে, দুটো গল্প-টল্প না ক'রে, এমন তাড়াতাড়ি খেতে বলতুম না তোমাদের

যদি না আমার এদিদিটি একলা ঘর ফেলে এসে ফিরে যাবার জন্যে ছটফট করতেন।

রাণীর খাওয়া শেষ হলে রমা বললে, তোমাদের বেশীক্ষণ আটকে রাখতে চাইনি মা, এসো একটু আমার সঙ্গে!—বলে রাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে এসে তিনখানা ঘরের পর একটা ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রমা বললে, ওই ঘরে একটা ফুলের মালা আর খানিকটা চন্দন আছে, নিয়ে এস তো মা—আজ কুমারী-ভোজন করালুম কিনা। চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ফুলের মালা গলায় দিতে হয়।

রাণী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করল! ঘটনাটা দেখবার জন্যে রমা উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাণী পর্দাটা সরিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমে এদিক-ওদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলে, মালাচন্দনের চিহ্নমাত্র নেই। আছে যা, তা দেখে রাণী একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, মনে হতে লাগল, পায়ের নীচে হতে ঘরের মেঝেটা এখনই পড়ে যায় বা!···অলক তখনও ঘুমোচ্ছিল, রাণী ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। মস্ত উঁচু পালঙ্কের উপর অলক শুয়েছিল, রাণীর এ ব্যবধান সহ্য হল না, তাড়াতাড়ি একটা চৌকিতে পা দিয়ে লাফিয়ে পলঙ্কের উপরে উঠে অলককে নাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। রাণীর হাত দুটো আনন্দে ও ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। গায়ে হাত দিতেই অলকের ঘুম ভেঙে গেল। অলকের মুখের পানে তাকাতেই রাণীর সাহস হচ্ছিল না, তাই সে জেগে ওঠামাত্র রাণী অলককে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঢেকে বসে পড়ল! অলক রাণীকে এরূপভাবে ঘরের মধ্যে আসতে দেখে কিছুই বুঝতে পারছিল না, বোঝবার চেষ্টাও করলে না। হো-হো করে হেসে উঠে অলক চীৎকার করে ডাকল—জেঠি মা, দেখবে এসো।

রমার দ্বারাই যে এইরূপ ঘটেছে অলক তা কেমন করে জানবে? পাছে অলকের কথাটা কমলা অনীতা শুনতে পায় এই ভয়ে রমা, তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দরজার আড়ালে এসে দাড়াতেই পর্দার ফাঁকে দেখলে রাণী অলকের বুকের উপর মুখ রেখে ফিক্-ফিক্ করে হাসছে আর অলক প্রাণপণে তাকে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে। রমা খানিকক্ষণ প্রাণ ভরে দৃশ্যটা দেখে দৌড়ে গিয়ে কমলার ও অনীতার হাত ধরে তাদের এক প্রকার টানতে টানতে সেই দরজার নিকট এনে হাজির করলে। চুপি চুপি বললে, পর্দাটা একটুখানি ফাঁক করে' ভ্যাখ ভেতরে কি হচ্ছে। বলেই রমা আবার সেখান হতে ছুটে সিঁড়ি ধরে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

নীচের যে-ঘরটার অমরেশ বসেছিল, সেদিকে রমার দৃষ্টি পড়তেই দেখল, অমরেশ জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বিষণ্ণ-বদনে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে। রমা, হাসি চেপে রাখতে পারছিল না, মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজের হাসিটা দমন করে তাড়াতাড়ি সেখানটা পার হয়ে গেল। মনে মনে বললে—তুমি এ দৃশ্য দেখতে পাবে না নিষ্ঠুর, তোমাকেই বাদ দেব।

যে ঘরে রমেশবাবু বসতেন, সেই ঘরের সুমুখে গিয়ে দাড়াতেই রমা দেখল, মদ খেয়ে বেহুঁস অবস্থায় রমেশবাবু আরাম কেদারার উপর কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন—এ অবস্থায় অমরেশের নিকট যেতেও সাহস পান নি। রমার অবস্থা তখন ঠিক উন্মাদিনীর মত, মাথার চুলগুলো ছুটতে ছুটতে এলোমেলো হয়ে গেছে,—মুখে-চোখে এক অপূর্ব আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছে। তাড়াতাড়ি রমেশবাবুর নিকট গিয়ে, হো হো করে খানিকটা হেসে তার জামাটা ধরে এইটানে তাকে ,চয়ার হতে উঠিয়ে দিয়ে, রমা হাসতে হাসতে হিড়-হিড় করে তাকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। রমেশবাবু দু' একবার না যাবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু না পেরে অবশেষে রমার টানে-টানে সিঁড়ি ধরে একেবারে উপরে উঠে আসতে বাধ্য হলেন

একটা গোলমাল শুনে, কমলা ও অনীতা দরজার পাশ হতে চুপি-চুপি সজল চোখে পশ্চাৎ ফিরে তাকাতেই দেখলে, হাস্যময়ী উন্মাদিনী রমা রমেশবাবুর লম্বা দাড়ি ধরে টানছে আর হেসে একেবারে বিহ্বল হয়ে বলছে, শীগ্‌গির এস মিনসে, দেখবে এস কেমন মজা—দু'-বেতল মদ আজ নিজে বনে বসে খাওয়াব।

ব্যাপার দেখে অনীতা ও কমলা থাকতে পারলে না। বাইরে একটা বলরব শুনে অলক ও রাণী তাড়াতাড়ি খাট হতে নেমে বাইরে এসে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আনন্দে তাদের বুক দুটো এমনিভাবে ভরে উটেছিল যে, তারা না পারল চীৎকার করে হাস্‌তে, না পারল কোনো কথা বলতে।

কমলার ইচ্ছা হচ্ছিল, রমেশবাবুর মত অমরেশকেও এমনি টেনে এনে এই অপ্রত্যাশিত মিলন মঙ্গলটা দেখিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু রমার কৌশলে সে-বেচারী তখনও নীচের ঘরে তেমনি গালে হাত দিয়ে বসে সুদীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তিয় পর একটু জলযোগে এবং বিশ্রামের আশায় একটা ভৃত্যের শুভাগমন প্রতীক্ষায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

॥ শেষ ॥